রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর তরিকায় সহীহ নামাজ শিক্ষা

১. নিয়্যতঃ “নিয়্যত” আরবী শব্দ,এর অর্থ মন থেকে কোন কাজ করার ইচ্ছা করা।এর মানে এই না যে আপনাকে মুখে কোনকিছু বলতে হবে।আপনি যে ডিসিশন নিয়েছেন যে আপনি নামাজ পড়বেন,এতেই নিয়্যত হয়ে গেছে।আলাদাভাবে,বাংলায় বা আরবীতে কোন দোয়া পড়ার দরকার নেই।

২. তাকবীরে তাহরীমাঃ নামাজের শুরুতে আল্লাহু আকবার বলে কাঁধ পর্যন্ত অথবা কানের লতি পর্যন্ত হাত উঠাবেন।রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কখনো শুধু কাধ পর্যন্ত এবং কখনো

কানের লতি পর্যন্ত হাত উঠিয়েছেন,তাই দুইটা করাই সুন্নত।কখনো কাঁধ পর্যন্ত আবার কখনো কান পর্যন্ত হাত উঠাবেন।

২.১ সানা, সূরা ফাতিহা এবং সাথে অন্য কোন সূরা বা আয়াতঃ তাকবীরে তাহরীমার পরে হাত বাঁধা কে ‘কিয়াম’ বলে।‘কিয়াম’ শব্দের অর্থ দাঁড়ানো।হাত বাঁধার ক্ষেত্রে অনেকগুলো হাদীস আছে,তবে সব কয়টি হাদীসের মূল কথা হলো বাম হাতের উপরে ডান হাত রাখতে হবে,এক্ষেত্রে আপনি বাম হাতের কব্জির উপরে ডান হাত অথবা সম্পূর্ন বা হাতের উপরে আপনার ডান হাত

বিছিয়ে দিতে পারেন।কিন্তু প্রশ্ন হল কোথায় হাত বাঁধবেন?বুকে না নাভীর নীচে?কেউ বলে বুকে হাত বাঁধতে হবে,এবং কেউ বলে নাভীর নীচে হাত বাঁধতে হবে।তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মতামত হলো হাত স্বাভাবিক ভাবে যেখানে যায়,সেখানে হাত বাঁধতে হবে,এক্ষেত্রে পুরুষ আর নারী উভয়কেই একইভাবে হাত বাঁধতে হবে,পুরুষ আর নারীর নামাজের ভিতরে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই,এই বিষয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করা হয়েছে,আপাতত এইটুকু জানলেই হবে।

এখন স্বাভাবিক ভাবে হাত বাঁধলে দেখা যায় সেটি একদম বুকের উপরেও না আবার একদম নাভীর নীচেও না বরং বুক এবং নাভীর মাঝামাঝি অংশে পড়ে।তাই সরাসরি বুকের উপরে হাত বাঁধার দরকার নেই,আবার সরাসরি নাভির নীচে হাত বাঁধার দরকার নেই,স্বাভাবিক ভাবে এই দুয়ের মাঝামাঝি হাত বাঁধাই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মতামত।

এক্ষেত্রে,ছবি হিসেবে কাবা শরীফের প্রধান ইমাম “আবদুল্লাহ আস-সুদাইস” এর হাত বাঁধার ছবি দেওয়া হলো।ভালো করে দেখুন,হাত কোথায় বাঁধে।

হাত বাঁধার সময়ে সিজদার স্থানের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে।

হাত বেঁধে প্রথমে সানা পড়বেন।এরপর আপনি আঊজুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহর সাথে শুরু করে সূরা ফাতিহা পড়ুন।সূরা ফাতিহা না পড়লে নামাজ হবেনা।আল্লাহর রাসুল (সাঃ) থেমে থেমে সূরা ফাতিহা পড়তেন।অনেকে তাড়াহুড়ো করে সূরা ফাতিহা পরে,এটা ঠিক না।আপনিও সময় নিয়ে থেমে থেমে সূরা ফাতিহা পড়ুন।সূরা ফাতিহা পড়ার পর আপনি কুর'আন থেকে যেকোন একটি সূরার আয়াত বা পুরো একটি সূরা পড়তে পারেন।

উদাহরণ হিসেবে আপনি সূরা ফীল পড়লেন বা সূরা ফীলের প্রথম অর্ধেক বা শেষ অর্ধেকও পড়তে পারেন।সূরা ফাতিহা পড়ার পর অন্য কোন সূরা না পড়লেও হবে,যদি পড়েন তাহলে আপনার জন্য ভালো আর না পড়লে গুনাহ নেই।

৩. রুকুতে যাওয়াঃ রুকুতে যাওয়ার আগে আল্লাহু আকবার বলে তাকবীরে তাহরীমার মত কান [১] বা কাঁধ [২] পর্যন্ত হাত উঠিয়ে অথবা সরাসরি রুকুতে যেতে পারেন।রুকুতে যেয়ে হাত উঠানোর সময়ে দুইবার আল্লাহু আকবার বলার দরকার নাই,একবারই বলতে

হবে।আবার কখনো কখনো হাত না উঠিয়েই সরাসরি রুকুতে চলে যাওয়া যায় [৩] । দুইটাই করা যাবে।তবে আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) বেশীরভাগ সময়েই রুকুতে যাওয়ার সময়ে এবং রুকু থেকে উঠার সময়ে কাঁধ বা কানের লতি পর্যন্ত হাত উঠাতেন।এটাকে “রফউল ইয়ারদাইন” বলে।তাই বেশীরভাগ সময়েই রুকুর আগে দুই হাত কান পর্যন্ত উঠানো ভালো,এতে ১০ টি নেকি পাওয়া যায় এবং আল্লাহ তায়ালা এক একটি নেকি কে ৭০০ গুণ পর্যন্ত বর্ধিত করে দিতে পারেন।

রুকুতে যেয়ে এই দোয়া পড়বেনঃ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ “সুবহানা রব্বিয়াল আযীম”।‘সুবহানা’ শব্দের অর্থ মহাপবিত্র, ‘রব্বিয়াল’ শব্দের অর্থ রব,যিনি আমাদের পরিচালিত করেন এবং ‘আযীম’ শব্দের অর্থ মহান।তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় যে,”আমার রব মহাপবিত্র এবং মহান”।

যখন এই দোয়াটি পড়বেন,সবসময়ে এর বাংলা অর্থ মনে রাখবেন এবং চিন্তা করবেন যে আমি কিছুই না,বরং আমার আল্লাহ সবার উপরে,তিনিই সবচেয়ে পবিত্র এবং মহান।

নামাজের মধ্যে যত বেশী বিনয়ী হতে পারবেন,ততো বেশী সওয়াব পাবেন এবং মনের ভিতরে ততো বেশী শান্তি অনুভব করবেন।

“সুবহানা রব্বিয়াল আযীম”...এই দোয়াটি কমপক্ষে ৩বার অথবা ৫বার অথবা ৭ বার বা এর চেয়ে বেশীবার পড়তে পারেন,যত বেশি পড়বেন ততো বেশী ভালো।

রুকুর সময়ে মাথা,পিঠ এবং সারা শরীর সমান রাখবেন,কোন অংশ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি উঁচু বা বেশী নীচু হবেনা এবং হাত

ভাঁজ করা না বরং টানটান রাখবেন।কেউ কেউ রুকুর সময়ে সামান্য একটুও ভর দিতে চায় না এবং মাথা,পিঠ,ঘাড় বেশী উঁচু রাখে,এভাবে রুকু দিলে নামাজ হবেনা।

অনেকে বলে রুকুর সময়ে চোখের দৃষ্টি পায়ের গোঁড়ালির দিকে রাখতে হবে,কথাটি ভুল। রুকুর সময়েও সিজদার স্থানের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে।

উপরের চিত্র দুটি খেয়াল করুন।সঠিক রুকু করার নিয়ম এটি।মাথা,ঘাড়,পিঠ সোজা থাকবে।

এবার এই চিত্রটি খেয়াল করুন। রুকু করার ভুল নিয়ম এটি,মাথা,ঘাড় ও পিঠ সোজাসুজি নেই।আর দুঃখজনক হলেও সত্য যে অনেকেই এভাবে রুকু

করে,পুরোপুরি ভর দিতে চায় না।।এভাবে রুকু করলে নামাজ হবেনা।

৪. রুকু থেকে উঠাঃ রুকু থেকে উঠার সময়ে অনেকগুলি দোয়া পড়া যায়।একাকী নামাজের সময়ে বলবেন سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ সামি-আল্লাহ-হুলিমান-হামীদাহ এবং তারপরে

রব্বানা লাকাল হামদ رَبّنَا لَكَ الحَمدُ

অথবা

আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ

অথবা

রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ।

আপনার যেটা খুশী সেটাই পড়তে পারেন।

যদি রুকুতে যাওয়ার সময়ে কাঁধ বা কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে থাকেন,তাহলে রুকু থেকে উঠার সময়েও হাত উঠাবেন।আর যদি হাত না উঠিয়ে থাকেন,তাহলে আর উঠানোর দরকার নেই।তবে,বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই রুকুর আগে এবং পরে হাত উঠানো ভালো কারন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বেশীরভাগ সময়ে ওইভাবেই হাত উঠাতেন এবং এতে সওয়াব

বেশী পাওয়া যায়।তবে মাঝেমধ্যে ছেড়ে দেওয়াটাও ভালো।

জামায়াতে নামাজ পড়ার সময়ে ইমাম যখন বলবে সামি-আল্লাহ-হুলিমান হামীদাহ, তখন আপনি শুধু

রব্বানা লাকাল হামদ বললেই হবে,তবে ইমামের পিছনেও প্রথমে সামি-আল্লাহ-হুলিমান হামীদাহ এবং তারপরে রব্বানা লাকাল হামদও পড়া যাবে।একাকী নামাজের ক্ষেত্রে দুইটাই বলতে হবে।

“সামি আল্লাহ-হুলিমান হামীদাহ” শব্দের অর্থ-“আল্লাহ সব প্রশংসাই শুনেন।“ এবং “আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ”,এর অর্থ-“হে আল্লাহ!সমস্ত প্রশংসা তো আপনারই”।

৫. সিজদায় যাওয়ার আগে করণীয়ঃ

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) রুকু থেকে উঠেই সরাসরি দ্রুত সিজদায় যেতেন না বরং রুকু থেকে উঠে বেশ কিছু সময় সোজা দাঁড়িয়ে থাকতেন।একে আরবীতে ‘ক্বওমাহ’ বলে। সাধারণত,রুকুতে যেয়ে উনি যত সময় পর্যন্ত

রুকুর বাক্যগুলি পড়তেন,প্রায় সেই সময় পর্যন্তই রুকু থেকে উঠার পড়েও দাঁড়িয়ে থাকতেন। [৪]

অর্থাৎ,উনি যদি রুকুতে যেয়ে ৭ বার সুবহানা রব্বিয়াল আযীম পড়তেন,রুকু থেকে উঠার পড়ে যখন সোজা হয়ে দাঁড়াতেন,তখন প্রায় সেই সময় পর্যন্তই দাঁড়িয়ে থাকতেন,সাথে সাথেই সিজদায় যেতেন না।

আপনি ৭ বার সুবাহানা রব্বিয়াল আযীম পড়লে মিনিমাম ৫ বার সুবহানা রব্বিয়াল আযীম পড়তে যেই সময় লাগে,সেই সময়

পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবেন।আর এই সময়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাববেন যে,আমি এখন সিজদায় যাওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে মাথা নত করবো,তার কাছে,যিনি আমার রব,যিনি আমার কাছ থেকে সবচেয়ে বেশী সম্মান পাওয়ার অধিকার রাখেন,তাকে সম্মান করার জন্য আমি সবচেয়ে বিনয়ী হয়ে সিজদা করবো।

যে ব্যাক্তি আল্লাহ্‌র কাছে নিজেকে নীচু করে,আল্লাহ তাকে অন্য সবার কাছে তাকে উঁচু করে দেন।

রুকু থেকে উঠে যদি একদম সেই সময় পর্যন্ত দাঁড়াতে না পারেন,তাহলে কমপক্ষে ৩ সেকেন্ড এর জন্য হলেও সোজা দাঁড়িয়ে থাকবেন,পাখি যেভাবে ঠোকর মারে,ওইভাবে দ্রুত রুকু সিজদাহ করা নিষেধ।হাপুস-হুপুস করে রুকু সিজদাহ করলে ওই নামাজ হবেনা।

৬. সিজদাহঃ সিজদাহ করার জন্য আল্লাহু-আকবার বলে সিজদায় চলে যাবেন,এসময়ে দুই হাটু আগে এবং হাত পরে ফেলা উচিৎ। উটের বসার মতো সিজদাহ করা নিষেধ।আর আমি উটের বসার ভিডিও থেকে দেখেছি যে, উট বসার সময়ে হাত আগে রাখে এবং

হাটু পরে রাখে।এর জন্য উটের বিপরীত হিসেবে হাটু আগে এবং হাত পরে রাখতে হবে।নিচে উটের বসার একটি ভিডিওর ১ম,৮ম এবং ১২তম সেকেন্ডের ছবি দেওয়া হলোঃ

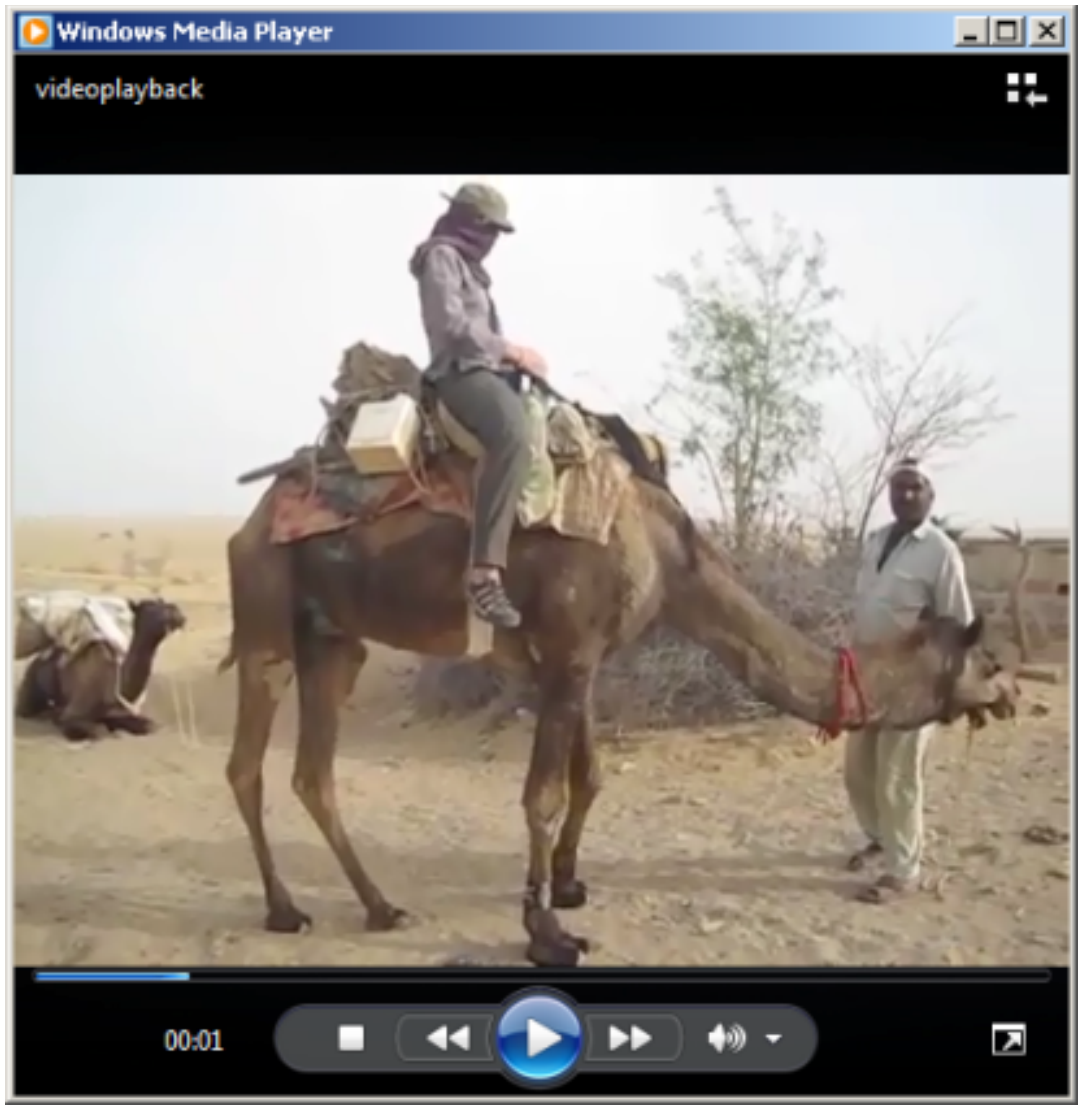
Windows Media Player
videoplayback
00:01

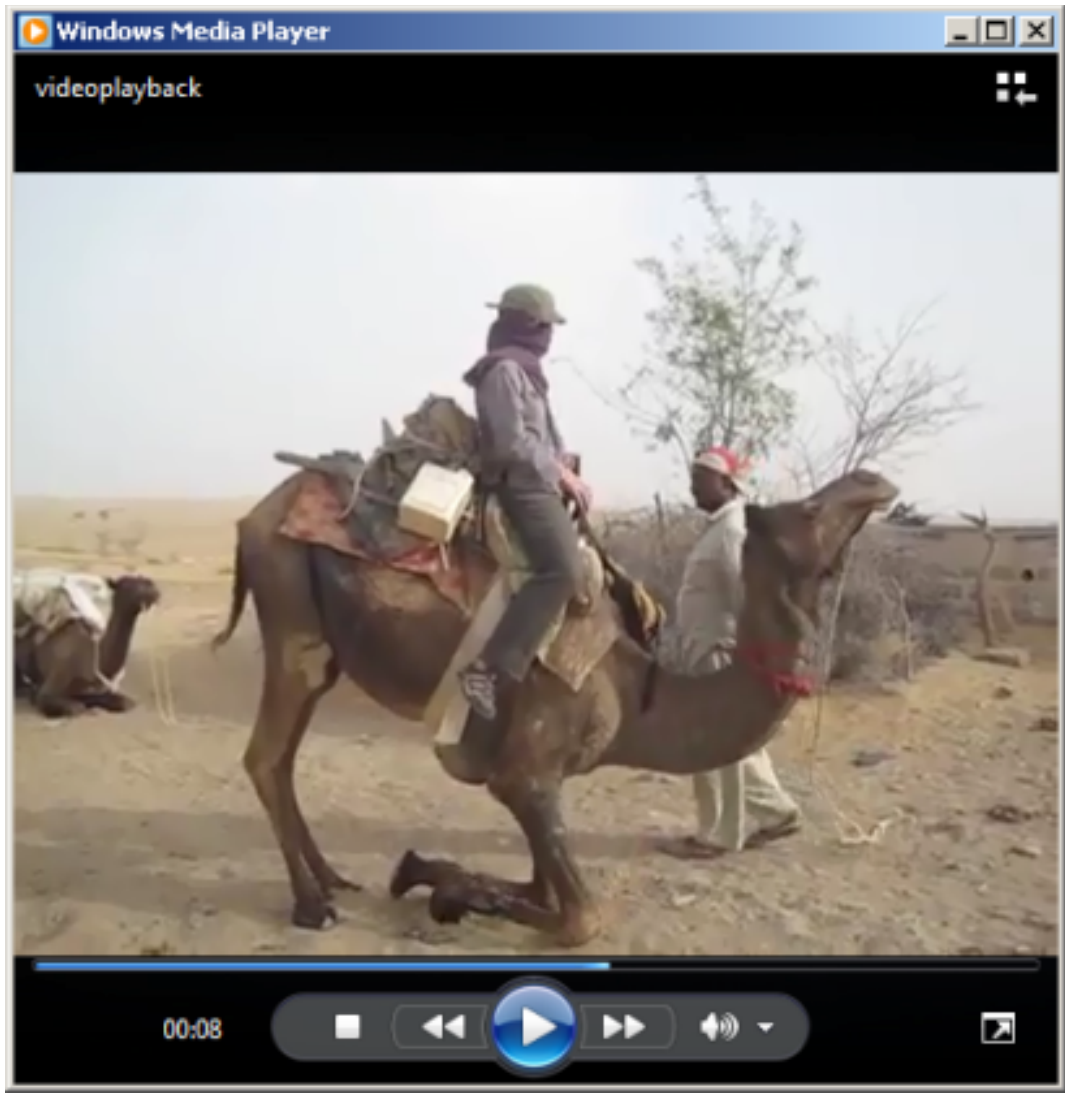
Windows Media Player
videoplayback
00:08

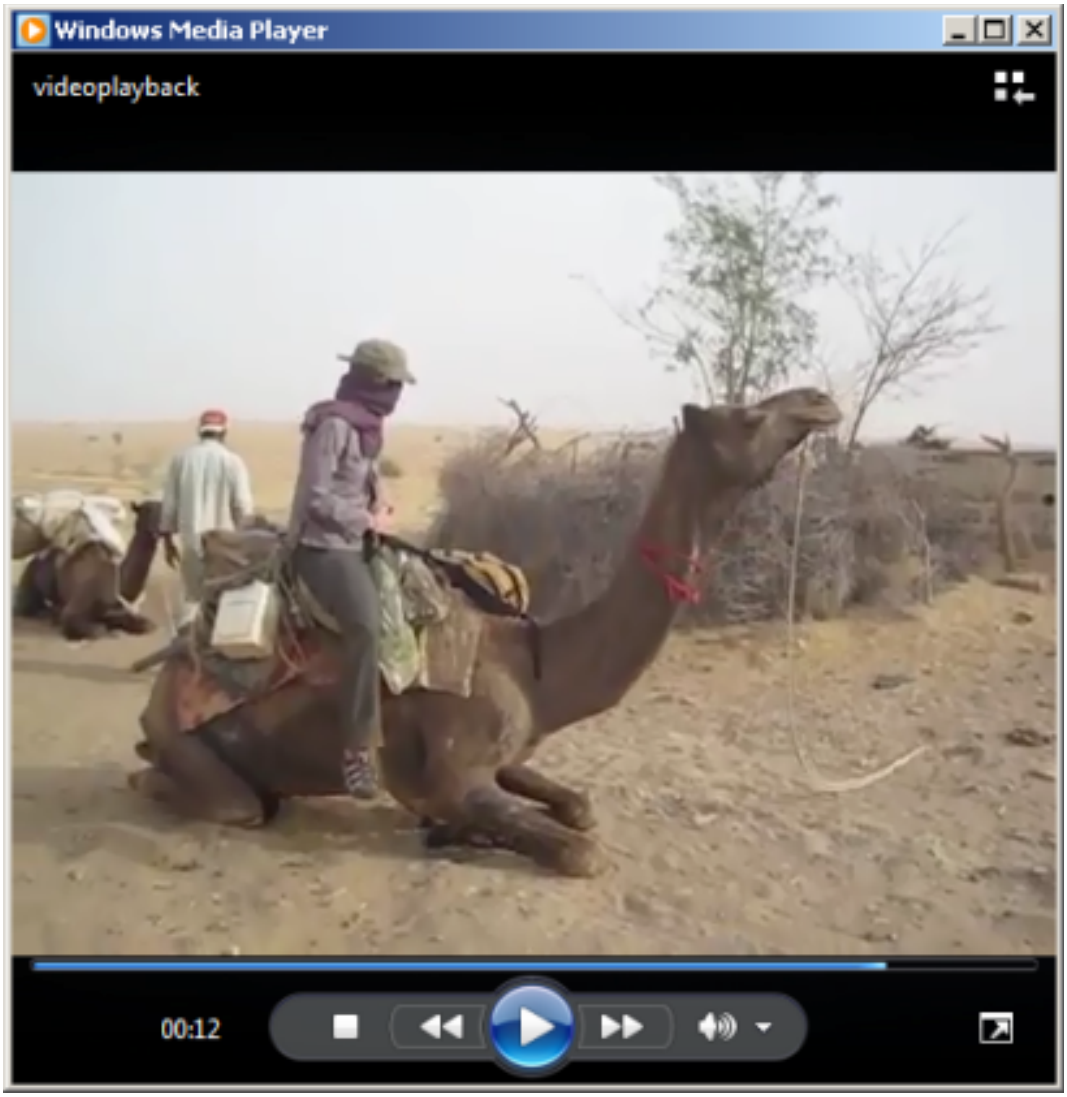

প্রথম সেকেন্ডের ছবিতে উটটি প্রথমে দাঁড়িয়ে ছিলো,৮ম সেকেন্ডে বসার সময়ে আগে হাত রাখে এবং ১২ সেকেন্ডে পা রাখে।

সুতরাং,এর বিপরীত হিসেবে আমরা আগে পা রাখব এবং পরে হাত রাখবো।

আরেকটি জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে কুকুরের মতো হাত যেন মাটির সাথে বিছিয়ে না দেই বরং দুই হাত উঁচু থাকবে এবং পেটের সাথে মিশে থাকবে না বরং ছড়ানো থাকবে। সিজদাহর সময়ে দুই পায়ের গোঁড়ালি মিশিয়ে রাখা সুন্নত।অনেকে দুই পায়ের গোঁড়ালি আলাদা রাখে,এইটা ঠিক না বরং দুই পায়ের গোঁড়ালি মিশে থাকা উত্তম।এবং পায়ের আঙ্গুলগুলি কিবলামূখী করে রাখতে হবে।

নিচের চিত্রটি খেয়াল করুন। সিজদাহর সঠিক নিয়ম এটিঃ

দেখুন,হাত বিছিয়ে দেওয়া হয়নি এবং পেট ও পায়ের সাথে মিশিয়েও রাখা হয়নি,পায়ের গোঁড়ালী মিশে রয়েছে।

এবার পরের চিত্রটি খেয়াল করুন।সিজদাহ দেওয়ার ভুল নিয়ম এটিঃ

দেখুন,উপরের ছবিতে হাত কুকুরের মতো বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং পেটের সাথে মিশিয়ে রাখা হয়েছে।রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এভাবে সিজদাহ করতে নিষেধ করেছেন।

সিজদাহর সময়ে দুই হাত কাঁধ অথবা কান বরাবর থাকবে এবং হাত কিবলামূখী রাখতে হবে।

সিজদাহর সময়ে কপাল ও নাক মাটিতে মিশিয়ে রাখবেন এবং পড়বেন سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى। “সুবহানা রব্বিয়াল আ’লা” ।

সুবাহানা শব্দের অর্থ মহাপবিত্র,রব্বিয়াল শব্দের অর্থ রব এবং আ'লা শব্দের অর্থ যিনি সর্বোচ্য,সবার উপরে।

সুতরাং,সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা শব্দের অর্থ "আমার রব মহাপবিত্র,এবং তিনি সবার উপরে"।

রব শব্দের অর্থ হলো প্রতিপালক,যিনি আপনাকে লালন পালন করেন,আপনাকে রিযিক দেন,আপনাকে কখনো দুঃখ কষ্ট দিয়ে আবার কখনো ধন সম্পদ দিয়ে পরীক্ষা

নেন,অর্থাৎ আপনাকে সবদিকে থেকেই নিয়ন্ত্রন করেন।

নামাজের মধ্যে বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে কাছে চলে আসে যখন সে সিজদাহ করে।এই সিজদাহর মধ্যেই দোয়া করার সর্বশ্রেষ্ঠ সময়। অনেকে নামাজ শেষে মুনাজাত করে দোয়া করে,কিন্তু রাসুলুল্লাহ নামাজের মধ্যে সিজদাহর সময়ে দোয়া করতেন।নামাজের শেষে দোয়া করার চেয়ে সিজদাহর মধ্যেই দোয়া করা বেশী ভালো।

প্রশ্ন হলো,আপনি কি সিজদাহর মধ্যে বাংলায় দোয়া করতে পারবেন?

উত্তর হলো, হ্যা পারবেন।বেশীরভাগ আলেমদের মতেই নামাজের মধ্যে সূরা-ক্বিরাত,তাকবীর এবং বিশেষ বাক্যগুলো আরবীতেই পড়তে হবে,কিন্তু আলাদা কোন দোয়া করতে চাইলে সেটা বাংলাতেও করা যাবে,কোন অসুবিধা নেই।আর এটাই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মতামত।আপনি সিজদার মধ্যে যা খুশী চাইতে পারেন।যখন সিজদাহ করবেন,"সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা" কয়েকবার বলার পরে আপনি বাংলায় যা যা

দোয়া করতে চান,করতে পারেন।দীর্ঘক্ষণ ধরে সিজদাহ দেওয়া ভালো।আল্লাহর রাসুল (সাঃ) সিজদাহর মধ্যে দোয়া করে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় পার করে দিতেন।

দোয়া করার জন্য সবচেয়ে উত্তম সময়ই হলো সিজদাহ।অন্য সময়ে দোয়া করলে যে দোয়া কবুল হবেনা তা নয়,তবে সিজদাহর সময়ে দোয়া করলে সেটা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী।

তাই চেষ্টা করবেন,দোয়া করার ক্ষেত্রে বেশীরভাগ সময়েই যেন সিজদাহ কে বেছে নিতে।

৬.১ দুই সিজদাহর মধ্যবর্তী দোয়াঃ প্রথম সিজদাহ থেকে উঠার পর বাম পায়ের পাতার উপর বসবেন এবং ডান পায়ের আঙুলগুলি কিবলামূখী রাখবেন।এ সময়ে পড়বেনঃ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ، رَبِّ اغْفِرْ لِي اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ
রব্বিগফিরলি রব্বিগফিরলি রব্বিগফিরলি

আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়াহদীনী ওয়ারযুকনী ওয়া আফিনী ওয়াজবুরনী।

এর অর্থঃ রব্বিগফিরলি - আল্লাহ,আমাকে মাফ করুন

রব্বিগফিরলি - আল্লাহ,আমাকে মাফ করুন

রব্বিগফিরলি - আল্লাহ,আমাকে মাফ করুন

আল্লাহুম্মাগফিরলী - আল্লাহ,আমার উপর থেকে আপনার ক্রোধ উঠিয়ে নিন

ওয়ারহামনী -

আমার উপর দয়া (রহম) করুন

ওয়াহ্দীনী -

আমাকে সঠিক পথ দেখান

ওয়ারযুকনী -

আমাকে রিযিক দিন

ওয়া আফিনী -

আমাকে সুস্থ্যতা দিন

ওয়াজবুরনী -

আমাকে পূর্ণতা দিন

এই দোয়া ছাড়াও আপনি শুধুমাত্র “রব্বিগফিরলি” কমপক্ষে দুইবার পড়তে পারেন।

প্রশ্ন হলো,দুই সিজদাহ্‌র মধ্যবর্তী সময়ে কত সময়ের জন্য বসবেন?এর উত্তর হলো,আপনি সিজদাহ্‌র সময়ে যতটুকু সময় নিয়েছিলেন,দুই সিজদাহ্‌র মধ্যেও প্রায় সেই পরিমান সময় বসে থাকা উচিৎ।আপনি যখন দুই সিজদাহ্‌র মধ্যবর্তী সময়ে উক্ত দোয়া পড়বেন,তখন সেটিকে বাংলায় অনুবাদ করার চেষ্টা করবেন।নামাজ বুঝে বুঝে পড়ার সওয়াব অনেক বেশী,অনেক অনেক বেশী।

দুই সিজদাহর মধ্যবর্তী দোয়া পড়ার পরে দ্বিতীয় সিজদায় যাবেন এবং আগের নিয়মেই সিজদাহ করবেন।সিজদাহ থেকে আল্লাহু আকবার বলে উঠে দাঁড়ানোর পরে আগের নিয়মেই নামাজ পড়বেন এবং দ্বিতীয় রাকা'আত শেষে তাশাহুদে বসবেন।

৭. বেজোড় রাকা'আতে সিজদাহ থেকে উঠার নিয়মঃ বেজোড় রাকা'আতে যেমন ১ম ও ৩য় রাকা'আতের সিজদাহ শেষে সরাসরি না উঠে বরং দুই-এক সেকেন্ডের জন্য একটু বসে তারপর মাটিতে হাত রেখে

ভর করে উঠে দাঁড়ানো সুন্নত।অনেকেই বেজোর রাকা'আতে সিজদাহ থেকে সরাসরি উঠে দাঁড়িয়ে যায়,আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এরুপ করতেন না।যুবক বয়সেই হোক বা বৃদ্ধ বয়সেই হোক,রাসুল্লুল্লাহ (সাঃ) যখন সিজদাহ থেকে উঠতেন,তখন সরাসরি উঠে দাঁড়াতেন না বরং দুই হাতে আগে মাটিতে ভর করে তারপর উঠে দাঁড়াতেন।

৮. তাশাহুদে বসাঃ দ্বিতীয় রাকা'আতে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সিজদাহর মাঝের বৈঠকের মতই বাম পা বিছিয়ে তার উপর ভর করে

এবং ডান পায়ের আঙুলগুলি কিবলামূখী করে রাখতেন।

ছবিতে দেখুনঃ (দ্বিতীয় রাকা'আতে বসার নিয়ম)

কিন্তু দুই রাকা’আতের বেশি অর্থ্যাৎ,৩ বা ৪ রাকা’আত বিশিষ্ট নামাজে দ্বিতীয়বার তাশাহুদে বসার সময়ে প্রথমবারের মত বাম

পা বিছিয়ে তার উপর ভর করে বসতেন না বরং নিতম্বের উপর ভর করে এবং বাম পা কে ডান পায়ের উরুর নীচে রাখতেন।

৩য়,৪র্থ বা আরো পরের রাকা'আতে বসার চিত্রটি দেখুনঃ

চিত্রটি দেখলে বুঝতে পারবেন যে,পরেরবারের তাশাহুদে বাম পা কে ডান পায়ের নীচ দিয়ে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং নিতম্বের উপর ভর করে বসে থাকা হয়েছে।

দুই রাকা’আত বিশিষ্ট নামাজে তাশাহুদে বসে প্রথমে ‘আত্তাহ্যিয়াতু’ পড়বেন এবং এরপর দরুদ শরীফ এবং তারপরে অন্য যেকোন দোয়া যেমন “দোয়া মাছুরা” এবং ইচ্ছা করলে সেইসাথে আরো দোয়া পড়ে আপনি সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করতে পারেন। এসময়েও বাংলাতে দোয়া করা যাবে।আপনি চেষ্টা করবেন সিজদাহর সময়ে যেভাবে দোয়া করেছেন,আত্তাহ্যিয়াতু-দরুদ শরীফ-দোয়া মাছুরা পড়ার পরেও ওইভাবে দোয়া করতে।

আর দুই এর বেশী যেমন তিন বা চার রাকা'আত বিশিষ্ট নামাজে শুধুমাত্র 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়ে দাঁড়িয়ে গেলেই হবে। তবে এই সময়েও দরুদ শরীফ পড়া মুস্তাহাব বা উত্তম।

৮.১ তাশাহুদের সময়ে আংগুলের সাহায্যে ইশারা করাঃ তাশাহুদে বসে থাকা অবস্থায় পুরোটা সময়ে হাতের শাহাদাৎ আংগুল (তর্জনী) উঁচু থাকবে এবং রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ওই আংগুলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখতেন।এসময়ে তর্জনী বাদে হাতের অন্য

আংগুলগুলিকে ভাঁজ করে রাখতেন।এসময়ে হাত নাড়িয়ে দোয়ার ইশারা করতেন।অনেকে আত্তাহ্যিয়াতু পড়ার সময়ে যখন “লা——“ উচ্চারন করে,তখন হাতের আঙ্গুল উঠায়।এর চেয়ে বেশী উত্তম তাশাহুদে বসে থাকার পুরোটা সময়ে অর্থ্যাৎ,তাশাহুদ থেকে না উঠা অথবা সালাম ফেরানোর আগ পর্যন্ত হাতের আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারা করে দোয়া করার পক্ষে অধিকাংশ গ্রহণযোগ্য হাদীস পাওয়া যায়,তাই এইটা করাই উত্তম।এসময়ে হাতের আঙ্গুলগুলো হালকা নাড়িয়ে ইশারা দিতে হয়,তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন এমনভাবে

আংগুল নাড়ানো না হয় যাতে পাশে বসে থাকা কারোর দৃষ্টি আপনার দিকে না চলে আসে এবং তার অসুবিধা না হয়।রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,এই আংগুলের ইশারা শয়তানের নিকট লৌহদন্ডের আঘাত অপেক্ষা বেশী কষ্টদায়ক।

৯. তৃতীয় রাকা'আতঃ দ্বিতীয় রাকা'আতের তাশাহুদ শেষে অর্থ্যাৎ,আত্তাহিয়্যাতু-দরুদ শরীফ শেষে উঠে দাড়িয়ে তৃতীয় রাকা'আতের শুরুতে কাঁধ বা কান পর্যন্ত হাত উঠাতে হয়,এক্ষেত্রেও

আলাদাভাবে দুইবার করে আল্লাহু আকবার বলার প্রয়োজনীয়তা নেই বরং উঠে দাঁড়ানোর সময়ে যখন আল্লাহু আকবার বলেন,ওইটার সাথে সাথেই হাত উঠালে হবে।তবে রুকুর আগে-পড়ে যদি হাত উঠিয়ে না থাকেন,তাহলে এটি করার দরকার নেই।তৃতীয় রাকা'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়তে হয়,অন্য কোন সূরা না পড়লে সমস্যা নেই,তবে পড়লেও সমস্যা নেই।অর্থ্যাৎ, প্রথম ও দ্বিতীয় রাকা'আতে সাধারণত সূরা ফাতিহার পরে অন্য কোন সূরা বা সূরার আয়াত পড়া ভালো কিন্তু তৃতীয় রাকা'আত

থেকে সূরা ফাতিহার পর আর কোন সূরা না পড়লেও হবে।এরপরে স্বাভাবিক নিয়মেই রুকু সিজদাহ করতে হবে।তবে মনে রাখতে হবে যে,যদি প্রথম ও দ্বিতীয় রাকা'আতে যদি রুকুর আগে-পরে কাঁধ বা কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে থাকেন,তাহলে তৃতীয় রাকা'আতেও একইভাবে হাত উঠাতে হবে আর বেশীরভাগ সময়েই রুকুর আগে পরে হাত উঠানো উত্তম।এটিকে 'রফঊল ইয়ারদাইন' বলে এবং বেশিরভাগ সময়েই রফঊল ইয়ারদাইন করা উত্তম।আমাদের বাংলাদেশের বেশীরভাগ জায়গায় রফউল ইয়ারদাইন না

করা হলেও পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে যেমন সৌদী আরব থেকে শুরু করে কাতার,কুয়েইত,মিশর,আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়ার মুসলিমরা পর্যন্ত এটা করে।তবে মাঝে মধ্যে এটা না করার পক্ষেও হাদীস আছে।তাই বেশীরভাগ সময়ে রফঊল ইয়ারদাইন করা এবং মাঝেমধ্যে ছেড়ে দেওয়া উত্তম।

১০. সালাম ফিরানোঃ তাশাহুদে বসে যখন আত্তাহ্যিয়াতু,দরুদ শরীফ এবং অন্য কোন দোয়া পড়া শেষ হয়ে যাবে।তখন

“আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ” বলে প্রথমে ডানে এবং পরেরবার “আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ” বলে বায়ে সালাম ফিরাতে হবে।সালাম ফিরানোর ক্ষেত্রে অনেকেই ঘাড় ঘুড়ানোর সময়ে আগে নিচের দিকে মুখ ঘুড়িয়ে তারপর ডানে-বায়ে মুখ ঘুড়ায়,এটি ঠিক না বরং স্বাভাবিকভাবে সরাসরি ডানে-বায়ে মুখ ঘুড়াতে হবে,নীচে তাকানোর দরকার নেই। একটি হাদীসে এসেছে,রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সালাম ফিরানোর সময়ে তার দুই গালের শুভ্রতা দেখা যেত।

সহীহ মুসলিমের আরেকটি হাদীস থেকে আগে বায়ে মুখ ফিরানো এবং পরে ডানে মুখ ফিরানো সম্পর্কেও হাদীস পাওয়া যায়।তবে এই কাজটি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) খুব কম সময়েই করেছেন।অর্থ্যাৎ, হঠাৎ হঠাৎ সময়ে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আগে বায়ে মুখ ফিরিয়েছেন এবং পরে ডানে মুখ ফিরিয়েছেন।তাই মাঝে মধ্যে আগে বাইয়ে এবং পরে ডানে মুখ ফিরানোও সুন্নত।

ইবনে খুজাইমায় বর্ণিত আরেকটি হাদীসে শুধু একদিকে মুখ ফেরানোর হাদীসের কথাও বর্ণিত আছে।রাসুলুল্লাহ (সাঃ) শুধু

“আসসালামু আলাইকুম” বলে সামান্য ডানে মুখ ফিরাতেন।তাই এটিও করা যাবে,তবে একবার ডানে সালাম ফিরানোর ক্ষেত্রে পুরোপুরি মুখ ঘুড়াতেন না বরং সামান্য একটু ঘুড়াতেন।

১১.নামাজ শেষে যিকরঃ আমরা নামাজ শেষে অনেকেই উঠে চলে যাই,উঠে চলে গেলে যে গুনাহ হবে তা নয় তবে আমাদের উচিৎ হবে সুন্নতসম্মত যিকর করা যেগুলো হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।অনেক হাদীস দ্বারা

প্রমাণিত হয়েছে যে,রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ফরজ নামাজ শেষে বিভিন্ন ধরনের দোয়া ও যিকর করতেন।এগুলোর মধ্যে কয়েকটি হলো

নামাজ শেষে ৩ বার আসতাগফিরুল্লাহ,আসতাগফিরুল্লাহ,আসতাগফিরুল্লাহ পড়া। “আসতাগফিরুল্লাহ” শব্দের অর্থ, ”আল্লাহ আমাকে মাফ করুন”।

এরপর আরো পড়তেন اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَ الْإِكْرَامِ
“আল্লাহুম্মা আংতাস সালাম-ওয়া মিংকাস সালাম-তাবা রকতা ইয়া যাল জালালী ওয়াল ইকরম”।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনিই শান্তি,শান্তি আপনার কাছ থেকেই আসে।বরকতময় আপনি,সম্মান ও মান মর্যাদার অধিকারী আপনি।

এরপর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ মহাপবিত্র),৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ (আল্লাহ প্রশংসনীয়) এবং ৩৪ বার আল্লাহু-আকবার (আল্লাহ সবার থেকে বড়) পড়তেন।

আবার কখনো কখনো ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ,৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ পড়ে ৩৪ বার আল্লাহু-আকবার না পড়ে বরং ৩৩

বার আল্লাহু-আকবার বলে ১ বার লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ পড়তেন।তাই আপনার উচিৎ দুইটাই করা।কখনো ৩৩ বার করে সুবহানআল্লাহ,আলহামদুলিল্লাহ পড়ে ৩৪ বার আল্লাহু-আকবার পড়া এবং কখনো কখনো ৩৩ বার করেই সুবহানআল্লাহ,আলহামদুলিল্লাহ এবং আল্লাহু-আকবার পড়ে একবার লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ পড়া।

নামাজ শেষে “আয়াতুল কুরসী” পড়ার পক্ষেও হাদীস আছে।আয়াতুল কুরসী হলো

সূরা বাকারার ২৫৫ নাম্বার আয়াত।যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের শেষে আয়াতুল কুরসী পড়বে,তার এবং জান্নাতের মধ্যবর্তী দুরত্ব হবে শুধু মৃত্যু।এই প্রসঙ্গে অনেকেই এই ব্যাখ্যা দেন যে,মৃত্যুর পরেই সে সরাসরি বিনা হিসেবে জান্নাতে চলে যাবে।আল্লাহই ভাল জানেন।

سُبحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهِ

একটি বিশেষ জিকরঃ আপনি কি জানেন, গুনাহ থেকে মাফ পাওয়ার জন্য খুবই সহজ

এবং খুবই ছোট একটি জিকর আছে যেটা প্রতিদিন ১০০ বার পড়লে তার গুনাহর পরিমাণ যদি সাগরের ফেনার তুল্যও হয়,তবুও মাফ হয়ে যাবে?

হ্যা,এরকমই একটি জিকর হল " سُبحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهِ " উচ্চারণঃ "সুবহানাল্লিহি ওয়া বিহামদীহ" । [এখনই মুখস্ত করে রাখুন,এটা খুবই জরুরী]

সুবহানাল্লাহি শব্দের অর্থ "আল্লাহ মহাপবিত্র" , "ওয়া" শব্দের অর্থ "এবং" , "বিহামদীহ" শব্দের অর্থ প্রশংসনীয় ।

তাহলে এর অর্থ কি দাড়ায়? এর অর্থ হল "আমার আল্লাহ মহাপবিত্র এবং প্রশংসনীয়" ।

সহীহ বুখারীতে এই জিকরটি সম্পর্কে হাদীসটি এসেছে। আর আরেকটি বিষয় জানেন? আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় দুটি বাক্যের একটি হল এটি।অপরটি হল "সুবহানাল্লাহিল আযীম" যার অর্থ "আমার আল্লাহ মহাপবিত্র এবং মহান" ।

খুবই ছোট এবং দুইটা জিকরই প্রায় একই। শুধু প্রথমটিতে সুবহানাল্লাহর পরে "ওয়া

বিহামদীহ" আর পরেরটায় সুবহানাল্লাহর পরে "আযীম" বলতে হয় ।

আমরা সবাই প্রতিদিন কমবেশী অনেক গুনাহ করি আর এই গুনাহ মাফ করিয়ে নেওয়ার জন্য যদি এত সহজে এত ছোট্ট একটি বাক্য দিয়ে যদি মাফ করিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকে,তাহলে করতে আলসেমী কিসের?

এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে গিফট।আল্লাহ আমাদের গুনাহ মাফ করিয়ে নেওয়ার অনেক সুযোগ দেন,খুব সহজে।আল্লাহ সবসময়েই

তাঁর বান্দাদেরকে ভালোবাসেন,আর তাকে ক্ষমা করে দিতে চান,এর জন্য যত সহজভাবে সম্ভব,ততো সহজে মাফ করিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করে দেন।

এই জিকরটি প্রতিদিন ১০০ বার করে পড়বেন,আরো বেশীও পড়া যায় এবং পড়লে আরও ভালো,তবে ১০০ বার পড়লেই গুনাহ মাফ হয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট।এত ছোটো একটি জিকর দেখে অবজ্ঞা করবেন না,বেশ কয়েকটি হাদীসে বলা হয়েছে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় বাক্য এটি।যেটি আল্লাহর কাছে

সবচেয়ে প্রিয় বাক্য হতে পারে,সেই বাক্য উচ্চারণের জন্য পুরস্কার কেমন হতে পারে তা কল্পনা করে বের করতে পারবেন?

এই জিকরটি ১০০ বার পড়তে খুব বেশী সময় লাগেনা।৫-৭ মিনিটের মধ্যেই হয়ে যায়। অভ্যাস করবেন প্রতিদিন যেকোন নামাজের পড়ে বা মসজিদে যাওয়ার সময়ে রাস্তার মধ্যে এটি পড়তে পড়তে যাওয়ার।

সাধারণত যেকোন নামাজের সময়ে বা অন্য সময়ের মধ্যেও পড়ে নিতে পারেন। এক্ষেত্রে আপনি জোহর বা আসরের নামাজ পড়তে

যাওয়ার সময়ে ৬০ বার পড়লেন,আবার নামাজ শেষ করে বাসায় আসার সময়ে আরও ৪০ বার পড়ে নিলেন।

অথবা নামাজ শেষ করার পরে ৫-৬ মিনিট বসে পড়ে নিলেন।

আপনার যেভাবেই সুবিধা হয়,পড়ে নিবেন। কিন্তু এইটা পরার অভ্যাস অবশ্যই করতেই হবে,অবশ্যই।

আজকে থেকেই অভ্যাস করুন।প্রতিদিনই পড়বেন।মাঝে মধ্যে ভুল হয়ে যাবে, এগুলো ব্যাপার না।

ভুল মানুষেরই হয়।যদি কখনো মিস হয়ে যায়,তাহলে পরে পড়ে নিবেন।মাঝে মাঝে মিস হয়ে গেলে গুনাহ নেই।

কিন্তু এই জিকর করার অভ্যাস যেন আজকে থেকেই শুরু হয়ে যায়,সেই চেষ্টা করবেন।

এছাড়াও নামাজ শেষে আরো অনেক ধরনের যিকর এর কথা বলা হয়েছে অনেক হাদীসে। আপনারা হাদীস থেকে সেগুলো পরে নিতে পারেন।যারা ইসলাম সম্পর্কে এবং হাদীস পড়তে আগ্রহী,তারা বাজার থেকে আন্দাজে বিভিন্ন বই না কিনে প্রথমে "সহীহ মুসলিম" অথবা "রিয়াদুস সালেহিন" এবং পরবর্তীতে "সহীহ বুখারী" কিনে পড়তে পারেন।

এছাড়াও বুলুগুল মারাম,দোয়ার জন্য হিসনুল মুসলিম,কুর'আনের তাফসীর হিসেবে "তাফসীরে ইবনে কাসীর" অথবা

ছোট তাফসীর হিসেবে “আহসানুল বায়ান ” পড়তে পারেন।

তবে এগুলোর সব কিছুই যে আপনি বুঝে ফেলবেন তা নয়,কিছু বুঝবেন,কিছু হয়তো বুঝবেন না।আর যেগুলো বুঝবেন না,সেগুলো সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য আলেমের সাহায্য নিতে পারেন।তবে আমি এটুকু বলতে পারবো যে এসব হাদীসের বেশীরভাগই বুঝতে পারবেন এবং অনেক কিছু জানতে পারবেন।তাই আমি বলবো দ্বীনি শিক্ষা চালিয়ে যান,আপনি যখন দ্বীন শিখতে চাবেন,আল্লাহ তখন আপনাকে সাহায্য করবেন,আর আল্লাহ

সাহায্য করলে আর কোন কিছুরই দরকার নেই।যারা সিনেমা দেখে,ফেসবুক চালিয়ে,গান শুনে সময় নষ্ট করেন,তারা বাজার থেকে তিন-চারশো টাকার মধ্যে সহীহ মুসলিম বা সহীহ বুখারী বা রিয়াদুস সালেহিন কিনে ফেলে পড়া শুরু করতে পারেন।অনেকের বাসায়ই দেখা যায়,সহীহ বুখারী বা সহীহ মুসলিমের নামে চিকন চিকন কিছু বই থাকে। এগুলো অরজিনাল বই না বরং অরিজিনাল বুখারী-মুসলিম ৭০০ থেকে ১০০০ পৃষ্ঠার বেশী থাকে,আর ছোট ছোট ওইসব বইয়ে হাদীসের পুরোপুরি অংশ বা ব্যাখ্যা থাকেনা

ফলে ভুল বুঝতে পারেন।এজন্য,আমার মতে অরিজিনাল বই কিনলে ভালো হবে আর এগুলো পড়ে আপনার সময় কেটে যাবে। টিভি দেখে,গান শুনে,উপন্যাস পড়ে সময় না কাটিয়ে এগুলো পরে সময় কাটান,দেখবেন আপনি অনেক কিছু জানতে পারবেন এবং আপনার লাইফ চেঞ্জ হয়ে যাবে। বুখারী শরীফ পড়ার আগে আমি মুসলিম শরীফ পড়তে বললাম কারণ,বুখারীর তুলনায় মুসলিম শরীফের অধ্যায় ও হাদীসগুলো খুব সুন্দরভাবে সাজানো গোছানো থাকে,এতে পড়তে সুবিধা হয়।মুসলিম শরীফ কিনলে

ইসলামিক ফাউন্ডেশনেরটা এবং বুখারী শরীফ কিনলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন অথবা তাওহীদ পাবলিকেশনেরটা কিনতে পারেন। অন্য প্রকাশনীর বইগুলো সম্পর্কে আমার খুব ভালো একটা ধারণা নেই,তাই বলতে পারবোনা এগুলো কেমন,কিন্তু আমার কাছে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এবং তাওহীদ প্রকাশনীর উভয়টাই ভালো মনে হয়েছে তাই আমি এ দুটির যেকোন একটি পড়তে বলবো। আপনি চাইলে মোবাইলেও “বাংলা হাদীস” বা “iHadis” অ্যাপটি ডাউনলোড করে পড়তে পারেন,তবে আমার মতে বইয়ের

একটা হার্ড কপি কিনে সেটা পড়াই ভালো কারন মোবাইলের স্ক্রিনে পড়ে খুব বেশী সুবিধা পাওয়া যায়না।

আর কুর'আন অবশ্যই পড়বেন।শুধু আরবী না বরং কুর'আনের বাংলা অনুবাদসহ পড়বেন।প্রতিদিন ১০ আয়াত বা তার চেয়ে কম করে হলেও এবং পারলে বেশী পড়া উচিৎ।তবে,একটা কথা বলতেই হয় যে আরবী ভাষার কোন বিকল্প নেই,কুর'আনের কোন অনুবাদই আরবি ভাষার সমতুল্য হতে পারেনা।বাংলা অনুবাদে কিছু ভুল থাককবে,এইটাই স্বাভাবিক।তাই চেষ্টা করবেন

সঠিকটা জানার এবং ভুলগুলো শুধরানোর জন্য উস্তাদ নু’মান আলী খানের লেকচার শুনতে পারেন।বাংলা ভাষায় উনার লেকচারগুলো www.nakbangla.com এ অনুবাদ করা হচ্ছে,সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিন।

১২. কিছু প্রশ্ন এবং উত্তরঃ

ক. অনেকেই এখন হাদীস নিয়ে প্রশ্ন করে হাদীস সহীহ অথবা দঈফ বা দুর্বল কিনা ।সহীহ এবং দঈফ হাদীস বলে কি কিছু আছে?

উত্তরঃ হ্যা আছে।হাদীসকে সহীহ,হাসান,দঈফ,মাওদু বা জাল ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা যায়।আসুন বুঝতে চেষ্টা করি কিভাবে একটি হাদীসকে সহীহ বা গ্রহণযোগ্য এবং একটি হাদীসকে দুর্বল বা অগ্রহণযোগ্য হিসেবে ধরা হয়।হাদীস বলতে রাসুল্লুল্লাহ (সাঃ) এর কথা,কাজ বা সম্মতিকে বুঝায়।রাসুলুল্লাহ (সাঃ) যা বলতেন,সাহাবীরা এগুলো মুখস্ত রাখতো এবং তাদের পাড়া প্রতিবেশী,ছেলে মেয়ে,বন্ধু বান্ধবদের কাছেও প্রচার করতো।কিন্তু সেই সময়ে হাদীস কেউ লিখে রাখতো না। রাসুল্লুল্লাহ (সাঃ) এর মৃত্যুর অনেক পরে ইমাম মালিক এবং পরবর্তীতে ইমাম বুখারীর মতো

মুহাদ্দিসরা এগুলো সংগ্রহ করে লিখে রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন।আর তখন থেকেই হাদীসগুলো লিখে রাখা হত।কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করলেই বুঝবেন,যে ইমাম মালিক বা ইমাম বুখারীর মতো মুহাদ্দিসরা তো রাসুলুল্লাহ এবং তার প্রধান প্রধান সাহাবীদের মৃত্যুর অনেক পড়ে জন্মেছিলেন,তাহলে বুখারী শরীফের হাদীসে লেখা থাকে "আবু হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত....."।একটা জিনিস খেয়াল করে দেখুন,এখানে আবু হুরায়রা (রাঃ) এর কথা বর্ণনা করা হয়েছে।আপনার কি মনে হয়,ইমাম বুখারী যখন ওই হাদীসটা লিখেছেন তখন

আবু হুরাইরা (রাঃ) জীবিত ছিলেন?অবশ্যই না।তাহলে ইমাম বুখারী কিভাবে বললেন যে আবু হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্নিত?আসলে ব্যাপারটি হচ্ছে,এখানে সরাসরি আবু হুরাইরা (রাঃ) ইমাম বুখারীকে হাদীসটি বলে জাননি বরং উনি হয়তো বলেছিলেন তার কোন বন্ধুকে,তার বন্ধু আবার সেই হাদীসটি বলেছিলো তার ছেলেকে,আর তার ছেলে হয়তো বলেছেন ইমাম বুখারীকে।তাহলে হাদীসটা এভাবে হবে যে,"আমি অমুকের মুখে বলতে শুনেছি যে ছিলো অমুকের বন্ধু,সে আবার শুনেছে অমুকের বাবার কাছ থেকে,সে শুনেছে অমুকের কাছ থেকে এবং সে আবু

হুরাইরা (রাঃ) কে বলতে শুনেছে...” ।
হাদীসগুলো আসলে এভাবেই লেখা থাকে।
কিন্তু এভাবে সবার নাম পরিচয় লিখতে গেলে
অনেক জায়গা এবং সময় লাগবে,এজন্য
সাধারণত হাদীসের বইগুলোতে সরাসরি প্রধান
বক্তা যেমন আবু হুরাইরা (রাঃ),উমার (রাঃ)
বা আয়িশা (রাঃ) এর নাম দিয়ে দেওয়া
হয়,বাকী যাদের মাধ্যমে হাদীসটা বর্ননা করা
হয়েছে,তাদের নাম উল্লেখ করা থাকেনা।এদের
মধ্যে সবার কথাই যে বিশ্বাস করা যাবে,তা নয়।
এদের মধ্য কিছু লোক ছিলো,যারা মিথ্যা
কথাও বানিয়ে বানিয়ে বলতো,এজন্য কোন
মিথ্যাবাদী বা বেশী বয়স্ক ব্যক্তি যাদের স্মৃতিভ্রষ্ট

হওয়ার সম্ভাবনা থাকে,তাদের বর্ণনাকৃত হাদীসগুলোকে দঈফ বা দূর্বল হাদীস হিসেবে সনাক্ত করা হয়।

এইবার একটা জাল হাদীস দিয়ে সরাসরি উদাহরন দেই।

“জ্ঞান অর্জনের জন্য সূদুর চীন দেশে যাও”। এটি একটি জাল হাদীস।অর্থ্যাৎ,বানোয়াট বা মিথ্যা হাদীস।কিন্তু কেন এই হাদীসটাকে মিথ্যা হাদীস বলে বিবেচনা করা হলো?

এর কারন হলো,এই হাদীসটা যে কয়জন বর্ণনা করেছিলো,এদের কেউই বিশেষ কোন আলেম

ছিলোনা,এদের সম্পর্কে বিশেষ কোন পরিচয়ও পাওয়া যায়না।আর যাদের সম্পর্কে বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায়না,তাদের অন্ধভাবে বিশ্বাস করারও কোন কারণ নেই।এজন্য এই হাদীসটাকে হাদীস শাস্ত্রের বিখ্যাত আলেম যেমন ইমাম বায়হাকী,ইমাম ইবন-আল-জাওযি প্রমূখ আলেমরা একে হাদীস বলে মানতে অস্বীকার করেছেন।এভাবেই কোনটি সহীহ,কোনটি দুর্বল হাদীস,তা বের করা হয়।

হাদীস কেন জাল করা হয়?ইসলামের শুরু থেকেই অনেক শত্রু ছিলো,কাফেররা যেমন শত্রুতা করত,তেমনি মুনাফিকরাও

মুসলমানদের বেশ ধরে শত্রুতা করত।এদের মধ্যে কিছু মানুষ ইচ্ছা করে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর নামে মিথ্যা হাদীস বানিয়ে প্রচার করতো।

আবার কিছু মানুষ আরেকজনের ভালো করার উদ্দেশ্য নিয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিতো।ইমাম আবু হানিফার সময়ে এক ব্যাক্তি কুর'আনের বিভিন্ন সূরা নিয়ে অনেকগুলো মিথ্যা হাদীস বানিয়েছিলো "যেমন অমূক সূরা পড়লে অমুক হবে,অমুক আয়াত পড়লে অমূক হবে" ইত্যাদি।তাকে পরবর্তীতে এর প্রমাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে স্বীকার করে যে সে হাদীস

জাল করেছিলো।তার কাছে মনে হয়েছিলো,যে বেশীরভাগ মানুষ ইমাম আবু হানিফার ফিকহের প্রতি বেশী আগ্রহী হয়ে পড়েছিলো এবং ইসলামের অন্য বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার কথা প্রায় ভুলেই গেছিলো,তাই তাদেরকে ফিরানোর জন্য তিনি কিছু হাদীস জাল করেন।যদিও তার উদ্দেশ্য ছিলো ভালো,কিন্তু সঠিক জ্ঞানের অভাবে সে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলো,ভালো কাজের উদ্দেশ্য মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া উচিৎ না।এভাবেই অনেক হাদীস জাল করা হতো।যার ফলে পরবর্তীতে মুহাদ্দিসরা সতর্ক হয়ে গেছিলেন

এবং কোনটি সহীহ এবং কোনটি দূর্বল হাদীস,তা বলে দিতেন।আমাদের সমাজেও এখনো হাদীস জাল করতে দেখা যায়।যেমন অনেকে বলে “এই কালেমাটি ১০ জনকে পাঠাও তাহলে ভালো সংবাদ পাবে,আর না পাঠালে খারাপ সংবাদ পাবে”...এগুলো ভিত্তিহীন কথা।এছাড়াও হাদীসের নামে আরো অনেক মিথ্যা কথা বলে বেড়ায় যেমনঃ

“যে নিজেকে চিনলো

সে আল্লাহকে চিনলো

-বিশ্বনবী মুহাম্মাদ”

অথচ এখানে হাদীসটি কোন সাহাবীর মাধ্যমে বলা হলো,কোন হাদীসের বইয়ে বলা হয়েছে,কিছুই উল্লেখ নেই।এই ব্যাপারগুলো সম্পর্কে আর অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়,তবে সময়ের অভাবে এখানে দেওয়া সম্ভব হলো না।আশাকরি,অল্প কথার মাধ্যমে এই ব্যাপারে আংশিকভাবে হলেও কিছুটা সন্দেহ দূর করা হয়েছে।

খ.আমীন সশব্দে নাকি মনে মনে বলতে হবে?

উত্তরঃ যেসব নামাজে সশব্দে কিরাত পড়া হয় যেমন ফজর,মাগরীব,এশার নামাজে সূরা ফাতিহা শেষে আমীন জোড়ে বলার ক্ষেত্রে

অনেক গ্রহণযোগ্য হাদীস বর্ণিত রয়েছে।আর আমীন মনে মনে বলার পক্ষে যেসব হাদীস রয়েছে,এসকল হাদীসের বর্ননাকারীদের সত্যবাদীতা নিয়ে মুহাদ্দিসদের সন্দেহ রয়েছে,তাই ওই হাদীসগুলো দূর্বল।তাই আমীন সশব্দে বলাই উত্তম।তবে এতটা জোড়ে বলা যাবেনা যাতে পাশে অন্য কোন ব্যাক্তির নামাজের মনোযোগ নষ্ট হয়ে যায়।এর জন্য খুব আস্তেও না,আবার খুব জোরেও না বরং স্বাভাবিক স্বরে আমীন বলা উত্তম।কাবা শরীফে এবং হজ্জের সময়েও সূরা ফাতিহা শেষে আমীন সশব্দে বলা হয়। এই সম্পর্কে

একটি হাদীসঃ ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া (রহঃ) আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন ইমাম আমীন বলবেন, তোমরাও তখন আমীন বলবে। কেননা, যে ব্যাক্তি ফিরিস্তাদের আমীন বলার সাথে একই সময় আমীন বলবে, তার পূর্ববতী সমস্ত পাপ মোচন হয়ে যাবে। রাবী ইবনু শিহাব বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমীন বলতেন।

সহীহ মুসলিম,হাদীস নাম্বার ৭৯৮ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

উপরের হাদীসটা পড়লেই বুঝা যায় যে আমীন সশব্দে বলতে হবে,আর ইমাম যদি সশব্দে আমিন না বলতো তাহলে ইমামের সাথে মিলিয়ে আমীন বলা যেত না।

গ. অনেকেই বলে,নামাজ শেষে সবাই মিলে যেই মুনাজাত করে,তা বিদ'আত? এটা আসলেই কি বিদ'আত?

উত্তরঃ নামাজ শেষে সবাই মিলে যেই মুনাজাত করে,এটা খুব বেশী গ্রহণযোগ্য কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত না।তবে এটা বিদ'আত কিনা তা সরাসরি বলার উপায় নেই বরং

আল্লাহই ভালো জানেন।তবে নামাজ শেষ করা বাদে অন্য সময়ে দুই হাত তুলে মুনাজাত করার পক্ষে অনেক হাদীস রয়েছে।সহীহ বুখারীর জুমু'আর অধ্যায়ের একটি হাদীসে আছে,রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যাক্তির অনুরোধে বৃষ্টির জন্য জুমু'আর খুৎবার সময়ে দুই হাত তুলে দোয়া করলেন।যেহেতু খুৎবার সময়ে দোয়া করেছিলেন,তাহলে সেটা অবশ্যই নামাজের আগে করেছিলেন।আর প্রত্যেক নামাজের পড়েই যদি উনি দুই হাত তুলে দোয়া করতেন,তাহলে তো জুমু'আর নামাজ শেষেই করতে পারতেন।তাহলে কেন নামাজের পরে

করলেন না?সুতরাং,এ থেকে বোঝা যায়,রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বা তার সাহাবীরা ফরজ নামাজ শেষে সবাই মিলে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করতেন না বরং ফরজ নামাজ শেষে বিভিন্ন যিকর এবং আমল করতেন।দোয়া করতে হলে সিজদাহর মধ্যে এবং তাশাহুদের মধ্যেই করা উত্তম।বিশেষ করে সিজদাহর মধ্যে করা দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী।

ঘ. ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া যাবে কি যাবেনা?

উত্তরঃ ইমামের পিছনেও সূরা ফাতিহা পড়া উচিৎ।তবে মনে মনে পড়তে হবে।

এ সম্পর্কে একটা হাদীস দেওয়া হলোঃ
ইসহাক ইবনু ইবরাহিম আল হানযালী (রহঃ) আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যাক্তি সালাত (নামায/নামাজ) আদায় করল (অথচ) তাতে উম্মুল কুরআন পাঠ করল না সে সালাত (নামায/নামাজ) হবে অসম্পূর্ণ তিন বার এটা বললেন। অতঃপর আবূ হুরায়রা (রাঃ) -কে জিজ্ঞাসা করা হল, আমরা তো ইমামের পেছনে থাকি (তখনো কি ফাতিহা

পড়ব?) তিনি বললেন , তখন মনে মনে তা পড়। কারণ আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি সালাতকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে অর্ধেক করে ভাগ করেছি। আর বান্দা যা চাইবে- তা সে পাবে। অতঃপর বান্দা যখন বলে, (সমস্ত প্রশংসা কৃতজ্ঞতা বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য); আল্লাহ তা'আলা এর জবাবে বলেন- আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। সে যখন বলে, 'আর রহমানির রহীম' (যিনি এই মুহূর্তে দয়া করছেন এবং এবং যার দয়া

চিরস্থায়ী); আল্লাহ তাআলা বলেন- বান্দা আমার তা‘রিফ করেছে, গুণগান করেছে। সে যখন বলে, ‘মালিকি ইয়াওমিদ্দ্বীন; (তিনি বিচার দিনের মালিক); তখন আল্লাহ বলেন- আমার বান্দা আমার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছে। তিনি এও বলেন, বান্দা সমস্ত কাজ আমার উপর সোপর্দ করেছে। সে যখন বলে, ‘ইয়্যাকানা‘বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন’ (আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি); তখন আল্লাহ বলেন- এটা আমার এবং আমার বান্দার মধ্যকার ব্যাপার। আমার বান্দা যা চায়

তাই দেয়া হবে। যখন সে বলে, ‘ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম, সিরাতাল্লাযীনা আন‘আমতা আলাইহিম, গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম অলাদ-দোয়াল্লীন’ (আমাদের সরল পথে পরিচালনা করুন। সেই পথে যাদেরকে পুরস্কৃত করেছেন, সেই পথে না যারা বিপথে চলে গেছে); তখন আল্লাহ বলেন- এসবই আমার বান্দার জন্য। আমার বান্দা যা চায় তা তাকে দেয়া হবে। সুফিয়ান বলেন, আলা ইবনু আবদুর রহমান ইবনু ইয়া‘কুবকে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে এ হাদীস বর্ণনা করে

শোনান। এ সময় তিনি রোগ শয্যায় ছিলেন এবং আমি তাকে দেখতে গিয়েছিলাম।

সহীহ মুসলিম,হাদীস নাম্বার ৭৬২(ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

ঙ. নারী আর পুরুষের নামাজের কি কোন পার্থক্য আছে?

উত্তরঃ নারী আর পুরুষের নামাজের মধ্যে পার্থক্য নেই।এই সম্পর্কে অনেক বইতে যেমন “ফতোয়ায় আলমগীরী” এবং আরো কিছু বইতে নারী পুরুষের নামাজের পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।কিন্তু কোন হাদীসের

উপর ভিত্তি করে এগুলো বলা হলো,সেগুলো উল্লেখ নেই।আর প্রমাণ ছাড়া কোন কিছু মানা যাবে না।নারী পুরুষের নামাজে পার্থক্য আছে বলে যেসব ফতোয়া দেওয়া হয়,এগুলো শুধুমাত্র কিছু আলেমের মতামত,এটা কোন হাদীস না,তাই এগুলো মানতেই হবে বা এগুলো সত্যিই হবে,এমন কোন কথা নেই। সহীহ বুখারীতে একটি হাদীসে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন "তোমরা সেভাবে সালাত আদায় করো যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছো।"এই হাদীসে নারী-পুরুষদের আলাদা করে বলা হয়নি,এখানে নারী পুরুষ

সবাইকেই উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে।তাই রাসুলুল্লাহ (সাঃ) যেভাবে নামাজ পড়েছেন, ঠিক সেভাবেই নামাজ পড়া উচিৎ,চাই সে নারী কিংবা পুরুষ হোক।অনেকেই নারীর শারীরিক গঠনের কথা বিবেচনা করে যুক্তি দেখায় যে,নারীদেরকে জড়োসড়ো হয়ে নামাজ পড়তে হবে।কিন্তু একটা জিনিস মানতেই হবে যে ইসলাম আমাদের নিজস্ব যুক্তি অনুযায়ী চলেনা।আর এই প্রসঙ্গে হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন,"ইসলাম যদি আমাদের দেওয়া যুক্তি অনুসারেই চলতো,তাহলে আমরা মোজার উপরিভাগে মাসেহ করতাম না বরং মোজার

নীচে মাসেহ করতাম।কেননা,মোজার উপরিভাগে ময়লা লাগেনা বরং নীচেই লাগে।” সুতরাং,আমাদের উচিৎ হবেনা নিজেদের ইচ্ছামত যুক্তি তৈরী করে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুলের আদেশ অমান্য করা। আমাদের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ এবং অল্প।তাই বুদ্ধিমানের মতো কাজ হবে বিনা দ্বিধায় আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুল (সাঃ) যা আদেশ করেছেন,তা পালন করা।বিনা দ্বিধায় আল্লাহ এবং আল্লাহর হুকুম পালন করাই ইসলাম।

১৩. ওজুর সঠিক নিয়মঃ ওজুর সঠিক নিয়ম সম্পর্কে মোটামুটি সবারই জানা আছে।তবে কিছু ভুল আছে যেগুলো আমাদের অজানা। আর এই ভুলগুলো সম্পর্কেই আলোচনা করবো।বাংলাদেশ,ভারত,পাকিস্তানেএবং বিশেষ করে আমাদের সমাজে ওজু করার সময়ে মাথা মাসেহ করার সময়ে ঘাড়ও মাসেহ করা হয়,এই ঘাড় মাসেহ করার হাদীসটি দুর্বল। মাথা মাসেহ করার সঠিক নিয়ম হচ্ছে দুই হাত সামনে থেকে পিছনের দিকে টেনে নিয়ে ঘাড়ের আগ পর্যন্ত অর্থ্যাৎ, পিছনের চুলের গোঁড়া

পর্যন্ত নিয়ে আবার সামনের দিকে হাত ফিরিয়ে আনা।

ওজুর নিয়ম এবং মাথা মাসেহ সম্পর্কে একটা হাদীস দেওয়া হলো,মনোযোগ দিয়ে পড়ুনঃ

মুহাম্মদ ইবনুস সাববাহ (রহঃ) আবদুল্লাহ ইবনু যায়িদ ইবনু আসিম আনসারী (রাঃ) যিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাহচর্য লাভ করেছিলেন। বর্ননাকারী বলেন, তাঁকে বলা হল যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওজুর মত ওজু করে আমাদের দেখিয়ে দিন। তখন তিনি পানির

পাত্র আনালেন। তারপর তা থেকে দুই হাতের উপর পানি ঢেলে উভয় হাত তিনবার ধুইলেন, তারপর পাত্রে হাত ঢুকিয়ে পানি নিয়ে কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন একই আজলা দিয়ে। এরুপ তিনবার করলেন। আবার পানিতে হাত ঢুকিয়ে পানি নিয়ে আবার মুখমন্ডল ধুইলেন। দুই হাত কনুই পর্যন্ত দুইবার করে ধুইলেন। তারপর হাত ঢুকিয়ে বের করে মাথা মাসেহ করলেন- দুই হাত সামনের দিকে আনলেন ও পিছন দিকে নিলেন। তারপর উভয় পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধুইলেন, এরপর বললেনঃ

এরুপ ছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওজু।

-সহীহ মুসলিম,হাদীস নাম্বার ৪৪৬ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

আর একটা হাদীসে সংক্ষিপ্তরুপে মাথা মাসেহ করার হাদীসঃ

ইসহাক ইবনু মূসা আনসারী...মালিক ইবনু আনাস (রাঃ) থেকে আমর ইবনু ইয়াহইয়া (রহঃ) উপরোক্ত সুত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এতে বলেছেন, “কুলি করলেন এবং নাকে

পানি দিলেন তিনবার” আর আজলার কথা বলেন নি। অবশ্য “সম্মুখের দিকে আনলেন ও পিছনের দিকে নিলেন- কথার পর বৃদ্ধি করেছেন, “মাথার সম্মুখ থেকে পেছন পর্যন্ত মাসেহ করেছেন এভাবে যে, মাথার সম্মুখ ভাগ থেকে মাসেহ আরম্ভ করলেন, এরপর উভয় হাত ঘাড় পর্যন্ত নিয়ে গেলেন; পুনরায় উভয় হাত ফিরিয়ে আনলেন যে স্হান থেকে আরম্ভ করেছিলেন সে স্থান পর্যন্ত, তারপর উভয় পা ধুইলেন।

সহীহ মুসলিম, হাদীস নাম্বার ৪৪৮ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

সুতরাং,ওজু করার সময়ে ঘাড় মাসেহ করা ঠিক না।শুধুমাত্র মাথা মাসেহ করতে হবে,ঠিক যেভাবে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) তার মাথা মাসেহ করেছেন।

অন্যান্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে ওজুর শুরুতে "বিসমিল্লাহ" বলে নিতে হবে।এবং ওজু শেষে "আলহামদুলিল্লাহ" বলতে হবে। এরপরে কেউ যদি প্রত্যেক ওজুর শেষে কালিমা শাহাদাৎ পড়ে,তাহলে সে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ঢুকতে চায়,সেই দরজা দিয়েই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।তাই ওজু শেষে কালিমা শাহাদাৎ পড়ার কথা ভুলবেন না।

ওজু করার ক্ষেত্রে শুধু ৩ বার না,২ বার এবং ১বার করেও ওজুর অঙ্গগুলো ধোয়ার কথাও বলা হয়েছে।চাইলে আপনি দুইবার করেও ধুতে পারেন,একবার করেও ধুতে পারেন।

কখনো ৩ বার করে,কখোনো ২ বার করে এবং কখনো ১ বার করে ধোয়া উত্তম।

১৪. নামাজে মনোযোগ ধরে রাখার নিয়মঃ

অনেকেই অভিযোগ করে যে তারা নামাজে মনোযোগ ধরে রাখতে পারেনা।এক্ষেত্রে পরিত্রান পাবার উপায় কি?

নামাজে মনোযোগ ধরে রাখতে না পারার পিছনে সবচেয়ে বড় কারণ হল পাপ ছাড়তে না পারা।মানুষ পাপ কাজ করতে করতে এমন অবস্থায় পোঁছে যায় যখন আল্লাহ তার অন্তরকে তালাবদ্ধ করে দেন।তখন তার অন্তর শক্ত হয়ে যায়,মনে আল্লাহর ভয় থাকেনা এবং নামাজেও মন বসেনা।এজন্য আমরা নিজেরাই দায়ী।আর এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার সবচেয়ে বড় উপায় হলো পাপ কাজ ছেড়ে দেওয়া।একদিনে সব পাপ কাজ আপনি ছাড়তে পারবেন না,আর সম্ভবও না।আর আমরা মানুষ হিসেবে কেউই ১০০% পার্ফেক্ট

নয়।আমাদের দ্বারা কিছু গুনাহ হবেই।কিন্তু এই গুনাহর পরিমান আমরা ইচ্ছা করলেই কমিয়ে আনতে পারি।আমরা প্রতিদিন যেসব ছোটবড় গুনাহ করি,একদিনে সব ছেড়ে দেওয়ার প্লান না করে আস্তে আস্তে যদি একটু একটু করেও গুনাহ করা কমাতে পারি,তাহলে আমাদের অন্তরের তালাবদ্ধ অবস্থা আবার ঠিক হয়ে যাবে,আবারো মনে আল্লাহর ভয় তৈরী হবে এবং নামাজে মন বসবে।তাই এখন থেকেই ডিসিশন নিন যে আপনি আস্তে আস্তে প্রথমে ছোট ছোট খারাপ কাজ এবং তারপরে বড় বড় খারাপ কাজ করা ছেড়ে দিবেন।তাহলে

দেখবেন যে আপনার মন এমনিতেই ঠিক হয়ে আসছে।আর আরেকটি কথা হলো,আপনি নামাজে মনোযোগ ধরে রাখতে পারেন না বলে এই না যে আপনি ডিসিশন নিলেন যে ভালো হয়ে যাবেন আর সাথে সাথেই আপনার নামাজে মনোযোগ ধরে রাখার ক্ষমতা চলে আসবে।ব্যাপারটা তা নয় বরং আস্তে আস্তে আপনার মনযোগ বাড়তে থাকবে।প্রথম দুই একদিন খুব বেশী পার্থক্য টের পাবেন না কিন্তু কয়েকদিন যাবার পর আপনি অবশ্যই টের পাবেন যে আপনার মধ্যে কিছু একটা পরিবর্তন আসছে।নামাজ পড়লে আপনার

মন ভাল হয়ে যাবে,খারাপ কাজ করতে গেলে আল্লাহর ভয় হবে,পুরোপুরি খারাপ কাজ ছাড়তে না পারলেও কখনো খারাপ কাজ যদি করেও বসেন,মনের মধ্যে একটা অপরাধবোধ সৃষ্টি হবে।আপনি অনুতপ্ত হবেন।আর এই অনুতপ্ত হওয়ার নামই তওবা।বান্দা যখন কোন খারাপ কাজ করে অনুতপ্ত হয়,সেটা যত বড় অপরাধই হোক না কেন,আল্লাহ ক্ষমা করে দেন।মনের ভিতর অনুতপ্ত হওয়া মানেই আপনি আল্লাহর কাছে লজ্জিত হয়েছেন,আপনি বুঝবেন যে আপনার পাপ আর কেউ না দেখলেও আল্লাহ দেখেছেন,আর

আপনি এর জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবেন।আর তখনি আল্লাহ আপনাকে মাফ করে দিবেন।আল্লাহ জানেন যে তার বান্দা পার্ফেক্ট নয়,সে অনেকবার অপরাধ করবে,অনেকবার তওবা করবে আবার অনেকবার তওবা ভাঙবে আবারো তওবা করবে এবং এতবার তওবা করে তওবা ভাঙ্গা সত্ত্বেও আল্লাহ মাফ করে দিবেন,শুধু মাফই করবেন না বরং মাফ করতেই থাকবেন এবং সেইসাথে রহমত বর্ষন করবেন।কেউ ভুল করার পর ক্ষমা চাইলে আল্লাহ আরও বেশী খুশী হন।আল্লাহর ক্ষমা থেকে কখনো নিরাশ

হবেন না।আপনি পাপ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যাবেন,আপনি মাফ চাইতে চাইতে ক্লান্ত হয়ে যাবেন কিন্তু আল্লাহ ক্ষমা করতে করতে ক্লান্ত হবেন না।আপনি ক্লান্ত হয়ে যেতে পারেন,কিন্তু আল্লাহ ক্লান্ত হোন না।মনে রাখবেন,আপনার অপরাধ যতোই বড় হক না কেন,আল্লাহর ক্ষমার কাছে কিছুই না।তাই যতবারই কোন পাপ করে ফেলেন না কেন,আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবেন।আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ ক্ষমা করবেনই,কোন সন্দেহ নাই।ক্ষমা চাইবেন নামাজের মধ্যে,সিজদাহর সময়ে।দোয়া করার ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম আছে,যেমন দোয়ার

শুরুতে আল্লাহকে তার প্রাপ্য সম্মান ও প্রশংসা দিয়ে তারপর আপনি আপনার জন্য দোয়া করুন। যেমনঃ “আল্লাহ,আপনি আমার রব।যাবতীয় প্রশংসা আপনার,কৃতজ্ঞতা আপনারই উদ্দেশ্যে,আমি আপনার বান্দা,আপনি শক্তিধর আমি দূর্বল,আপনি জ্ঞানবান আমি জ্ঞানহীন।“(এভাবে আল্লাহর প্রশংসা করার পর আপনি আপনার দোয়া করতে পারেন যেমনঃ) “আমি যে অপরাধ করেছি,তার জন্য আমি লজ্জিত,ক্ষমাপ্রার্থী। আমি জানি আপনি আমার ভবিষ্যতের সব কিছুই জানেন এবং আমি আরো জানি যে

এমন অপরাধ আমি ভবিষ্যতেও করে ফেলতে পারি,আমার ভবিষ্যতে যদি এরকম কিছু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে,তাহলে আপনি ভালো কোন আমল দিয়ে এটাকে পরিবর্তন করে দিন এবং আমাকে ক্ষমা করে দিন।নিশ্চই আপনি সবচেয়ে দয়ালু এবং ক্ষমাশীল।“

দেখুনঃ উপরে দোয়ার প্রথম অংশে আল্লাহর প্রশংসা করা হয়েছে এবং পরের অংশে নিজের জন্য দোয়া করা হয়েছে।এভাবে দোয়া করলে দোয়া সব সময়েই কবুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

আরেকটি বিষয়,দোয়া করার সময়ে আল্লাহকে অনেকে ‘তুমি’ বলে সম্বোধন করে।এর চেয়ে বরং আপনি বলে সম্বোধন করুন।

কেননা,আমরা স্কুল কলেজ,মাদ্রাসার শিক্ষক বা মুরুব্বীজনদের সাথে আপনি বলে কথা বলি কিন্তু তাদের চেয়েও অনেক অনেক বেশি সম্মান পাওয়ার যোগ্য আল্লাহ,তাহলে তার সাথে কিভাবে কথা বলতে হবে এটা বলার কোন অপেক্ষা রাখে?অবশ্যই আল্লাহকে আপনি বলে সম্বোধন করবেন।“আল্লাহ,তুমি আমাকে মাফ করে দাও” না বরং “আল্লাহ,আপনি আমাকে মাফ করে দিন”

বলবেন।কেউ তুমি বললে যে কাফের হয়ে যাবে তা নয়,অনেকেই তুমি বলে,এমনকি আলেমরাও।তবে তুমি বলার চেয়ে আপনি বলা অনেক বেশী ভালো।এজন্য এখন থেকে তুমির বদলে আপনি বলা শুরু করবেন।

এরপরে নামাজে মনোযোগ বাড়ানোর জন্য আর কিছু কাজ করতে পারেন যেমনঃ

সময় নিয়ে নামাজ পড়া।অনেকে তাড়াহুড়ো করে নামাজ পড়ে,এতে মনোযোগ বসবে না। নামাজে ৫ মিনিটের জায়গায় ১০ মিনিট নিন,ধীরে সুস্থে পড়ুন,দেখবেন যে আস্তে আস্তে

নামাজে মনোযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।প্রথম কয়েকদিনে কাজ না হলেও কিছুদিন পরে ঠিক হয়ে যাবে।প্রত্যেকটা জিনিসেরই পরিবর্তন হতে কিছু সময় লাগে,একদিনে সব হয়না।

রুকু সিজদাহর মধ্যে সময় নিন।মানুষ রুকু সিজদাহর দোয়া ৩ বার পড়ে,আপনি ৭ বার পড়ুন বা পারলে আর বেশী পড়ুন।রুকুতে যতক্ষন ছিলেন,রুকু থেক উঠেও প্রায় সেই পরিমান সময়ে দাঁড়িয়ে থাকুন,এসময়ে ভাবুন যে আপনি কার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন! আপনার রব কত প্রশংসিত,কত সম্মানিত,সেই কথা ভাবুন।আর ভাবতে

থাকেন যে আপনি এখন সিজদায় যাবেন এবং যতোটা সম্ভব,বিনয়ী হয়ে ধীরে ধীরে সিজদায় যাবেন।এছাড়া প্রথম সিজদায় যতক্ষন ছিলেন,সিজদাহ থেকে উঠার পরে দ্বিতীয় সিজদাহতে যাওয়ার আগেও প্রায় সেই পরিমাণ সময় পর্যন্ত বসে থাকুন এবং পারলে দুই সিজদাহর মধ্যের দোয়াটি পড়ুন।নামাজে মনোযোগ আসবেই।তবে প্রথম দিনেই না,কয়েকদিন পর থেকে সব আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে।

নামাজ বুঝে বুঝে পড়ার চেষ্টা করুন।আরবীতে যা পড়বেন,তা বাংলায় অনুবাদ করার চেষ্টা

করুন।যদিও বাংলা, আরবি ভাষার বিকল্প না। আরবী ভাষাকে পুরোপুরি সঠিকভাবে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা যায়না,সম্ভবও না।কিন্তু যতটুকু পারবেন,ততটুকুই লাভ।বাজার থেকে নামাজের মধ্যে কি কি পড়েন,তার বাংলা অর্থের একটি বই কিনে আনতে পারেন। এগুলো শিখতে বেশী সময় লাগে না।সর্বোচ্য ৭ দিন হলেই যথেষ্ট।এরইমধ্যে সবকিছু শিখে ফেলা যায়।আর মোবাইল ফোন থেকেও সফটওয়্যারের মাধ্যমে নামাজের মধ্যে কি কি পড়া হয়,তার বাংলা অর্থ বের করে ফেলা

যায়।এজন্য এই সফটওয়্যারটি ফ্রীতে ডাউনলোড করে দেখতে পারেন।

ডাউনলোড লিংকঃ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.greentech.salatbn

আর যদি একদমই না পারেন বাংলা অর্থ বের করতে,তাহলে ধীরে সুস্থে নামাজ পড়ার চেষ্টাই করেন।আমি যখন আরবীর বাংলা অর্থ জানতাম না,তখনো নামাজে মনোযোগ বসতো।অন্তত পক্ষে,রুকু সিজদাহর সময়ে কি পড়লেন,তার বাংলা অর্থ মুখস্ত করুন,এই

বইতে এগুলোর অর্থ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু নামাজের মধ্যে মনে রাখবেন যে আপনি এখন আল্লাহ্‌র সামনে নামাজ পড়তেছেন,আল্লাহ্‌ আপনাকে দেখছেন।সহীহ্‌ বুখারীর একটি হাদীসে আল্লাহ্‌র রাসুল (সাঃ) এই উপদেশটি দিয়েছেন।

এবং আরও একটি বিষয় হল নামাজকে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এবং আপনার ব্যাপারে প্রাইভেট অর্থ্যাৎ গোপনীয় রাখবেন। আপনি যে নামাজ পড়ছেন বা নামাজ পড়েন,এই ব্যাপারটা যতোটা সম্ভব গোপন

রাখবেন।অন্য কাউকে সরাসরি বলার দরকার নেই।একটা উদাহরণ দিয়ে বলি ধরুন,আপনি বাসা থেকে নামাজ পড়ার জন্য বাইরে বের হয়েছেন।এখন কেউ প্রশ্ন কর বসলো যে "কোথায় যান?" আপনি এই সময়ে হয়তো উত্তর দিবেন "নামাজ পড়তে"। কিন্তু একটু বুদ্ধি করে উত্তর দিয়ে আপনি এই ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতে পারেন। আপনি বরং ওই কথা না বলে এটা বলুন যে "এইতো সামনে।"

তাহলে আপনার মিথ্যা কথাও বলা হল না কারণ আপনি তো সামনেই যাচ্ছেন।আবার

অন্যদিকে আপনি যে নামাজ পড়েন,এই ব্যাপারটা মানুষকেও জানানো হল না,আপনি যে নামাজ পড়েন,এটা শুধু আল্লাহ জানলেই চলবে।মানুষকে জানালে সেই ব্যাপারটা অনেক সময় লোক দেখানোর মত হয়ে যায়।

আপনি হয়তো ভাবছেন,আমি তো লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নামাজ পড়িনা,তাহলে বললে অসুবিধা কি?

খবরদার এরকম ভাবলে অনেক বড় ভুল করবেন, শয়তানের চেয়ে নিজেকে চালাক ভাববেন না। শয়তান আপনার চেয়ে অনেক

চালাক। অনেক অনেক বেশী চালাক। আপনি শয়তানের চালাকি থেকে যতটুকু বেঁচে আছেন,তা শুধু আল্লাহ্‌র রহমতের কারণে। আল্লাহ্‌র রহমত না থাকলে আপনি কোনদিনও শয়তানের চালাকির সাথে পেরে উঠতে পারতেন না,কোনদিনও না।

সত্যি কথা বলতে আমরা যে শয়তানের হাত থেকে বেঁচে থাকি, এর পিছনে আমাদের কোন ক্রেডিট নেই,সব ক্রেডিট আল্লাহ্‌র।তিনিই আমাদের রক্ষা করেন।আল্লাহ্‌ ফেরেশতা দিয়েও আমাদেরকে শয়তানের হাত থেকে

অনেকভাবে রক্ষা করেন এজন্য নামাজের মধ্যে সূরা নাস এর মধ্যে আমরা পড়ি "মিং শাররীল ওয়াস-ওয়াসিল খন্নাস" অর্থাৎ, "আমি আশ্রয় চাই শয়তানের কু-প্ররোচনা থেকে"। এগুলো আমরা দেখি না,তাই বুঝিও না। তাহলে আমরা আল্লাহ্‌র কাছে কত দিক থেকে আর কি পরিমাণে ঋণী,চিন্তা করে দেখুন।এরপরেও আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ভুলে যাই।নামাজে কেন পড়তে হবে,আল্লাহ্‌র কাছে কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে এখন বুঝতে পারছেন?আমরা

৩০-৪০ ওয়াটের একটা লাইট ব্যবহার করলেই মাস গেলে টাকা বিল দেওয়া লাগে, আর আল্লাহ যে সুর্যের আলো দিচ্ছেন,সেইটা কত ওয়াটের লাইটের সমপরিমাণ এটা চিন্তা করতে পারবেন?আর এর জন্য কত টাকার বিল দিতে হচ্ছে আপনাকে?এরপরেও কি আমাদের ভাবা উচিত না যে কতখানি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিৎ আমাদের? যাইহোক,এখন সেই কথায় আসি যে ইবাদত যা করবো,গোপন রাখবো।প্রথম দিকে আমাদের মনে লোক দেখানোর ইচ্ছা আসবে

না,কিন্তু অনেক সময়ে আমাদের চেয়ে অনেক ভালো মানুষকেও শয়তান ধোঁকা দিয়ে পথভ্রষ্ট করে দেয়।তাই মাথায় চিন্তা থাকতে হবে যে,আমরা যাই করিনা কেন,সেটা শুধুমাত্র আল্লাহকে খুশী করার জন্যই করবো,মানুষকে জানানোর জন্য নয়।আমরা যাই করিনা কেন,আল্লাহ সবই দেখেন আর শুধু আল্লাহ দেখলেই হবে,আর কারোর দেখার দরকার নেই,দেখানোরও দরকার নেই।

অনেক সময়ে দেখা যায়,কেউ কেউ নামাজ পড়ে এসে ফেসবুকে পর্যন্ত স্ট্যাটাস দেয়

"বন্ধুরা,আজকে নামাজ পড়ে
আসলাম,আপনি পড়েছেন তো? "

অনেকে লিখে যে "আজকে জুম'আর নামাজ পরে আসলাম", "ফজরের নামাজ পড়ে আসলাম"। এগুলো লেখা ঠিক না।

আবার অনেক সময় হয়তো এমন হয় যে আপনি কারোর সাথে কথা বলছেন এমন সময়ে আযান দিয়ে দিলো,তখন বলে বসলেন "আযান হচ্ছে,এখন নামাজ পড়তে যাবো।" এভাবে না বলে আরেকটু বুদ্ধি করে ঘুড়িয়ে

ফিরিয়ে এটা বলুন যে "একটা কাজ আছে,পরে কথা হবে"।

এভাবে বলে বের হয়ে আসুন,কিন্তু নামাজ পড়ার ব্যাপারটা যেভাবেই হোক,একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে ব্যাপারটা গোপন করে দিবেন। তাহলে আপনার মনে কখনো লোক দখানোর চিন্তা আসতে পারবে না,সওয়াবও অনেক বেশী হবে।শুধু নাম কেন,ভালো কাজ যেটাই করেন না কেন,যতোটা সম্ভব গোপন রাখার চেষ্টা করবেন।কিছু জিনিস স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশিত হয়ে পড়ে।এই ধরুন,আপনাকে

সরাসরি কেউ মসজিদের ভিতরে যাওয়া দেখলে এমনিতেই বুঝবে যে আপনি নামাজ পড়তে যাচ্ছেন।এভাবে জানলে কোন গুনাহ নেই।যা আমাদের সামর্থ্যের বাইরে,সেগুলোর জন্য কোন গুনাহ হবেনা।আল্লাহ আমাদের সাধ্যের বাইরে কোন কিছু চাপিয়ে দেন না।

ভালো কাজ বা ইবাদত যা করবেন, ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানবে না,এমন মন-মানষিকতা তৈরি করুন,নামাজে মনোযোগ আসবেই,আসতে

বাধ্য।সব দিক থেকে আপনি মনে শান্তি পাবেন।

উপরের কথাগুলো পুরোপুরি নয়,বরং আংশিকভাবে মেনে চললেও আপনার নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে মনোযোগ আস্তে আস্তে অনেক বেড়ে যাবে ইনশা আল্লাহ।কিছুদিন সময় নিন,আস্তে আস্তে সহীহ-শুদ্ধ ভাবে নামাজ পড়তে শিখুন,এক সপ্তাহের মধ্যেই নামাজে মনোযোগ ফিরে আসবে।চেষ্টা করতে থাকুন,আল্লাহ আপনার চেষ্টা দেখতে চান,আপনি কাজ করতে পারলেন কিনা আল্লাহ তা দেখবেন না বরং আল্লাহ আপনার

চেষ্টা দেখবেন।আমরা মানুষরা অল্পতে খুশী হতে পারি না,কিন্তু বান্দা অল্প করলেই আল্লাহ্ অনেক খুশী হন এবং তার সওয়াব ৭০০ গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেন।আরেকটি বিষয় হলো,অনেকেই একদিনের মধ্যে পুরোপুরি ভালো হয়।একদিন দেখা যায় হঠাৎ করে ঘুম থেকে উঠেই ফজর নামাজ পড়ে,তারপর ৩-৪ দিন পর্যন্ত ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে এরপর হঠাৎ একদিন ফজরে ঘুম থেকে উঠতে না পারলে ফজর পড়ে নাই এজন্যে এক ওয়াক্তও নামাজ পড়েনা।ব্যাপারটা এমন,যেন পড়লে সব পড়বো আর না পড়লে কিছুই পড়বো না।

এই ধরণের মন মানষিকতা থাকলে কখনোই নামাজী হওয়ার মন মানষিকতা গড়ে তুলতে পারবেন না,কক্ষনোই না।চেষ্টা করবেন,যতটুকু পারবেন,ততটুকুই পড়তে।মাঝে মধ্যে এক ওয়াক্ত নামাজ পড়তে পারলেন না বলে অন্য ওয়াক্তও পড়বেন না বলে যদি ঠিক করেন,তাহলে লাভ পাবেন না।এইটা শয়তানের ধোকা।শয়তান জানে যে,মাঝেমধ্যে আমাদের ভুল হবেই।তখন শয়তান মনে মনে কুমন্ত্রণা দেয় যে,"আজকে যেহেতু এক ওয়াক্ত নামাজ পড়তে পারো নাই,তাই অন্য ওয়াক্তের নামাজ পড়েও লাভ নাই।বরং,তুমি কালকে

থেকে আবার ৫ ওয়াক্ত পড়ার চেষ্টা করো”।
এই ‘কালকে’ কালকেই থেকে যায়।একদিন
ঢিল দেওয়ার পড়ে আর পরেরদিন থেকেও
নামাজ পড়তে ইচ্ছা করেনা।এইভাবে শয়তান
আমাদের পথভ্রষ্ট করে দেয়।শয়তান খুব
চালাক,আপনাকে একটা খারাপ জিনিসকে
ভালো আর ভালো জিনিসকে খারাপ হিসেবে
দেখিয়ে আপনাকে বোকা বানাবে।কেউ যদি
এক ওয়াক্ত নামাজ মিস করে ফেলে,এবং
বাকী ৪ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে ফেলার ডিসিশন
নেয়,তাহলে সেটা খুব ভালো ডিসিশন।কিন্তু
শয়তান ধোকা দিয়ে সেটাকে খারাপ প্রমাণের

জন্য বোঝাবে যে,"এক ওয়াক্ত নামাজ যখন মিসই করলা,তখন বাকী ৪ ওয়াক্ত পড়ে কি হবে?" মূলত,এক ওয়াক্ত মিস গেলে বাকী ৪ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার মধ্যে খারাপ বা ক্ষতি হওয়ার কিছু নেই বরং যা পড়বেন তাই লাভ। কিন্তু শয়তান এইভাবেই আপনাকে ভালো কাজকে খারাপ হিসেবে আর খারাপ কাজকে ভালো হিসেবে বুঝিয়ে বোকা বানাবে।তাই শয়তানের বোকা বানানো থেকে সতর্ক থাকবেন।যে কয় ওয়াক্ত নামাজ পড়তে পারবেন,সেই কয় ওয়াক্তই পড়বেন।মাঝে মধ্যে কোন ওয়াক্ত মিস হয়ে যেতেই

পারে,সেইজন্য অন্য ওয়াক্তের নামাজ বাদ দিবেন না।মনে রাখবেন,আপনি যা পড়বেন,তাই ই আপনার লাভ।এ প্লাস না পেলেও অন্তত পাসটুকু তো করুন।এ প্লাস পাবোনা ভেবে যে পাস করার চেষ্টাই করব না,এই ধরণের মনোভাব কেন হবে?এই ধরনের মন মানষকিতা বাদ দিয়ে আস্তে আস্তে নামাজ পড়ার প্র্যাকটিস করলে এক সময়ে আপনি পুরোপুরি নামাজী হয়ে যেতে পারবেন।কিন্তু পড়লে ৫ ওয়াক্তই পড়বো,আর কোন একদিন এক ওয়াক্ত মিস গেলে আর কোন ওয়াক্তই পড়বো না টাইপের মনোভাব থাকলে আপনি

হয়ত এক মাস বা দুই মাস পর্যন্ত ভালো থাকবেন,তারপর আবারো আগে যা ছিলেন তাই হয়ে যাবেন।এজন্য এখন থেকে চেষ্টা করবেন,কোন এক ওয়াক্ত মিস গেলেও যেন এটা না ভেবে নামাজ ছেড়ে দেন যে পড়লে সব পড়বো নাহলে কিছুই পড়বো না।এভাবে চলতে গেলে কোনদিনও নামাজী হতে পারবেন না।

শেষ করবো একটা দু'আর মাধ্যমে – আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে বুঝার তাওফীক দেন এবং সেই অনুযায়ী চলার তাওফীক দেন।

আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে নিয়মিত এবং সঠিকভাবে নামাজ পড়ার সামর্থ্য দেন,আস্তে আস্তে খারাপ কাজগুলো ছেড়ে ভালোর দিকে আসার সামর্থ্য দান করেন।আমীন।

১৫. পরিশিষ্টঃ এখানে বিভিন্ন বিষয়ের রেফারেন্স দেওয়া হলো-

[১] [রুকুর আগে-পরে হাত উঠানো/রাফউল ইয়ারদাইন করা এবং কান পর্যন্ত হাত উঠানোর হাদীস] যুহায়র ইবনু হারব (রহঃ) ওয়াইল ইবনু হুজর (রাঃ) থেকে

বর্ণিত। তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –কে দেখেছেন তিনি যখন সালাত (নামায/নামাজ) শুরু করলেন তখন উভয় হাত উঠিয়ে তাকবীর বললেন। রাবী হুমাম বলেন, উভয় হাত কান বরাবর উঠালেন। তারপর কাপড়ে ঢেকে নিলেন (গায়ে চাঁদর দিলেন)। তারপর তার ডান হাত বাম হাতের উপর রাখলেন। তারপর রুকু করার সময় তার উভয় হাত কাপড় থেকে বের করলেন। পরে উভয় হাত উঠালেন এবং তাকবীর বলে রুকুতে গেলেন। যখন বললেন , তখন উভয় হাত তুললেন। পরে উভয় হাতের মাঝখানে

সিজদা করলেন। -সহীহ মুসলিম,হাদীস নাম্বার ৭৭৯ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

[২] [রুকুর আগে-পরে হাত উঠানো/রাফউল ইয়ারদাইন করা এবং কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠানোর হাদীস] কুতায়বা (রহঃ) ..... সালিম তাঁর পিতা ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাত শুরু করতেন এবং রুকূতে যেতেন; রুকূ থেকে মাথা তুলতেন তখন কাঁধ বরাবর হাত উঠাতেন। ইবনু আবী উমর তাঁর রিওয়ায়াতে আরো উল্লেখ করেন রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই সিজদার মাঝে হাত উঠাতেন না। - ইবনু মাজাহ ৮৫৮, বুখারী ও মুসলিম, তিরমিজী হাদিস নম্বরঃ ২৫৫ [আল মাদানী প্রকাশনী]

[৩] [নামাজের শুরুতেই শুধুমাত্র একবার এবং রুকুর আগে-পরে হাত না উঠানোর/রাফঊল ইয়ারদাইন না করার হাদীস]

উছমান ইবনু আবূ শাইবা ..... আলকামা (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, . আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লামের নামায সম্পর্কে শিক্ষা দেব না? রাবী বলেন, অতঃপর তিনি নামায আদায়কালে মাত্র একবার হাত উত্তোলন করেন- তিরমিযী ৭৪৮ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) (ইমাম তিরিমিযীর মতে হাদীসটি হাসান এবং ইমাম ইবনে হাজম এর মতে হাদীসটি সহীহ)

[৪] [রুকু থেকে উঠে সিজদাহর আগ পর্যন্ত দাঁড়ানো এবং দুই সিজদাহর মধ্যবর্তী সময়ে বসার পরিমাণ যে প্রায় সমপরিমাণ ছিলো,সেই সম্পর্কে হাদীস] বাদাল ইবনু মুহাব্বার **(রহঃ)** বারা'আ **(রাঃ)** থেকে বর্ণিত,

তিনি বলেন, সালাতে (নামাজে) দাঁড়ানো ও বসা অবস্থা ব্যাতিত নবী (সাঃ) এর রুকু সিজদাহ, দুই সিজদাহর মধ্যবর্তী সময় এবং রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানো, এগুলো প্রায় সমপরিমাণ ছিল। - সহীহ বুখারী, হাদীস নাম্বার ৭৫৬ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

[৫] বইতে ব্যবহৃত চিত্রগুলি গুগলের মাধ্যমে বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে।

১৬. শেষ কথাঃ নামাজ/সালাতের উপরে আর বিস্তারিত জানার জন্য আরো ভাল ভালো কিছু বই আছে।এগুলোতে আরো

বিস্তারিতভাবে অনেক কিছু বলা হয়েছে।এর মধ্যে ড.আসাদুল্লাহ আল-গালিব এর “সালাতুর রাসুল (সাঃ),শাইখ আব্দুল হামীদ ফাইযীর “সালাতে মুবাশশির (সাঃ) এবং আল্লামা আলবানীর সংকলন বই “রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর নামাজ” বইটি পড়তে পারেন।যারা হার্ড কপি কিনে পড়তে চান,তারা নিকটস্থ লাইব্রেরীতে খোঁজ নিতে পারেন আর যারা ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করতে চান,তাদের জন্য ডাউনলোড লিংক দেওয়া হলোঃ

বাংলা হাদীস অ্যাপঃ এই অ্যাপটির ভিতরে আসাদুল্লাহ গালিবের “সালাতুর রাসুল (সাঃ)” এবং আব্দুল হামীদ ফাইযীর “সালাতে মুবাশশির (সাঃ)” বইটি পাবেন। এছাড়াও এর ভিতরে বুখারী,মুসলিম,রিয়াদুস সালেহীন সহ আরো অনেক হাদীসের বই পাবেন।যারা সরাসরি বই কিনতে চান না,তারা মোবাইলে ফ্রীতে এই অ্যাপলিকেশন ডাউনলোড করে পড়তে পারবেন।

ডাউনলোড লিংক-
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hadithbd.banglahadith

আই-হাদীস অ্যাপঃ বাংলায় হাদীস পড়ার জন্য আর ভালো একটি হাদীসের অ্যাপ্লিকেশন হলো iHadis অ্যাপ।এর ভিতরেও বুখারী,মুসলিম,তিরমিযিসহ আরো অনেক হাদীসের বই পাবেন।“বাংলা হাদীস” অ্যাপটির মত এই অ্যাপ্লিকেশনে এত বেশি হাদীস আর বই না থাকলেও এই অ্যাপটির ডিজাইন অনেক ভালো হয়েছে।তাই পড়ে সুবিধা পাওয়া যায়।

ডাউনলোড লিংক- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihadis.ihadis

অর্থপূর্ন নামাজঃ যারা নামাজের কি পড়লেন তার বাংলা অর্থ জানতে চান,তাদের জন্য “অর্থপূর্ন নামাজ (সলাত)” এই অ্যাপটি খুবই উপকারে আসবে।এই অ্যাপটির ভিতরে খুব সুন্দর করে প্রত্যেকটা আরবী অক্ষরের অর্থ ভেঙে ভেঙে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং অ্যাপ্লিকেশনটির ডিজাইনও যথেষ্ট ভালো হয়েছে।আমি সবাইকেই বলবো এই অ্যাপটি ফ্রী তে ডাউনলোড করে ফোনে ইনস্টল করতে।

ডাউনলোড লিংক-
https://play.google.com/store/a

pps/details?id=com.greentech.salatbn

(পিডিএফ বই) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর নামাজঃ কম্পিউটার বা বড় মোবাইল স্ক্রিনে পড়ার উপোযোগী এই বইটি।নামাজের উপরে বাংলা ভাষায় আমার মতে সবচেয়ে ভালো বই এটি।তবে এটি কম্পিউটারে পড়েই বেশী সুবিধা পাওয়া যাবে,বাজারে এর হার্ড কপিও কিনতে পাওয়া যায়।মোবাইলের ডিসপ্লে ছোট হলে এই বই পড়ে সুবিধা পাবেন না আপনি। সেক্ষেত্রে “বাংলা হাদীস” অ্যাপ থেকে

“সালাতুর রাসুল (সাঃ) এবং “সালাতে মুবাশশির (সাঃ)” বই দুটি পড়তে পারেন।

ডাউনলোড লিংক-
http://preachingauthenticislaminbangla.blogspot.com/2013/07/blog-post_24.html

আর আরেকটি কথা,আপনি যে বইটিই পড়েন না কেন,একেক বইতে একেক বিষয় সম্পর্কে কিছু ভিন্নমত দেখতে পাবেন।
উদাহরনস্বরুপ,কিছু বইতে সিজদাহর সময়ে হাত আগে রাখা এবং পা পরে রাখা আবার কিছু বইতে পা আগে রাখা এবং হাত পড়ে

রাখার পক্ষে যুক্তি পাবেন আপনি।এসব ছোটখাটো মতভেদ থাকবেই,আপনার কাছে যেটা সঠিক মনে হয়,সেটা করবেন।যেমন আমার কাছে আগে পা এবং পড়ে হাত রাখার বিষয়টা সঠিক মনে হয়েছে এবং এই সম্পর্কে প্রমাণ হিসেবে উটের বসার ছবি দিয়েছি।তবে এসব নিয়ে কারোর সাথে তর্কাতর্কি বা ঝগড়া করবেন না।অনেকেই ধর্ম নিয়ে তর্কাতর্কি এবং ঝগড়া করে,এগুলো খুবই খারাপ অভ্যাস এবং গুনাহর কাজ।তাই এগুলো এড়িয়ে চলবেন।